# সোনার ঠাকুর

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

শশধর প্রকাশনী
১০/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

প্রকাশিকা : রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
শশধর প্রকাশনী
১০/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রণ : স্টার প্রিন্টিং প্রেস
২১/এ রাধানাথ বোস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ পট :
অঙ্কন : গৌতম রায়
মুদ্রণ : ইমপ্রেশন হাউ

SONAR THAKUR
by Syed Mustafa Siraj

উৎসর্গ

শ্রী বিমল বসু

প্রীতিভাজনেষু

কে ওখানে ?

আনমনা মানুষের গলায় প্রশ্ন করে তাকিয়ে রইলেন দীনগোপাল। দৃষ্টি রাস্তার ডানদিকে, যেখানে বৃক্ষলতার ঘন বুনোট। থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, হাতে ছড়ি।

নীতাও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে আস্তে আস্তে বলল—কেউ না, আসুন।

দীনগোপাল পা বাড়িয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন।—কী একটা ঘটছে, ঠিক বুঝতে পারছি না। হয়তো হ্যালুসিনেশান। অথচ—

থেমে গেলে নীতা বলল—কী ?

—অথচ তুই নিজেও তো পরশু বিকেলে দেখে এসে বললি, কেউ দাঁড়িয়ে ছিল। ঘাসগুলো সবে খাড়া হচ্ছিল। দীনগোপালের গলায় আরও অন্যমনস্কতা টের পাচ্ছিল নীতা। একটু পরে ফের বললেন—আমার বয়স হয়েছে। একটা চোখে ছানি। কিন্তু তুই—কথা কেড়ে নীতা বলল—কুকুরটুকুর হবে। ঘাসগুলো সোজা হচ্ছে দেখেছিলাম। তার মানে এই নয় যে, কোনও মানুষ এসে দাঁড়িয়ে ছিল!

—কিন্তু আমি মানুষই দেখেছিলাম।

নীতা একটু হাসল।—এখনও বুঝি মানুষ দেখলেন ? দীনগোপাল ঘুরে সেই জায়গাটার দিকে ছড়ি তুলে বললেন—হুঁ, মানুষই মনে হলো।

—কিন্তু আমি কাউকে দেখতে পেলাম না তো ?

একটু বিরক্ত হয়ে বললেন দীনগোপাল—তাহলে হ্যালুসিনেশান।

নীতা আর কথা বাড়াল না। হেমন্তের মাঝামাঝি এলাকার আবহাওয়ায় বেশ হিম পড়ে গেছে। এই শেষ বেলায় হিমটা জোরাল। কলকাতার সবচেয়ে শীতের কোনও রাতের মতো। দুধারে রুক্ষ অসমতল মাঠ, কিছু ঝোপঝাড় আর উঁচু গাছের জটলা। চাষবাসের

চিহ্ন কদাচিৎ। তবে বসতির দিকটায় একটা ক্যানেল এবং কিছুটা সমতল মাটি উর্বরতা এনেছে। আধ কিলোমিটার দূরে এখনই কুয়াশার ভেতর বাতি জ্বলে উঠল। অথচ পেছনে পশ্চিমে দূরে টিলার মাথায় ডুবুডুবু সূর্যের লালচে ছটা। আদিবাসী মেয়ে-পুরুষের একটা দল পাশ কাটিয়ে বোবা চলে গেল। খাটতে গিয়েছিল সরডিহিতে।

একটা উঁচু ডাঙ্গা জমির ওপর দীনগোপালের বাড়ি। পুরনো লালরঙের দোতলা বাড়ি। পাঁচিল ঘেরা চৌহদ্দি। এখানে সেখানে ধসে গেছে। কাঠ দিয়ে সেখানে বেড়া দেওয়া হয়েছে। পুরনো ফুলফলের গাছপালার চেহারায় ক্রমশঃ আদিম ছাপ ঘন হয়ে উঠেছে। পোড়ো হানাবাড়ি দেখায় নীচের রাস্তা থেকে।

ছড়ির ডগায় চাপ দিয়ে রাস্তা থেকে গেটে উঠছিলেন দীনগোপাল। একটু আগের মতো ফের বলে উঠলেন কে ওখানে?

নীতা রাগ করে বলল—ভূত!

দীনগোপাল কিছু বলার আগেই সাড়া এল—আমি জ্যাঠামশাই! দীপু।

নীতা ছটফটে ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল।—দীপুদা! কখন এলে? বউদি আসেনি?

দীপেন্দু দীনগোপালের পা ছুঁয়ে প্রণাম করার পর বলল—নবর কাছে শুনলাম বেড়াতে বেরিয়েছেন। তাই আপনাদের খুঁজতে যাচ্ছিলাম। তারপর নীতার উদ্দেশে বলল—তোর বউদি আসবে কী? সামনে স্কুলের পরীক্ষা। দিদিমণিদের এখন সিরিয়াস অবস্থা। তা তোর খবর কী বল?

দীনগোপাল দীপেন্দুর কাঁধে হাত রেখে বাড়ি ঢুকলেন। নীতা বলল—আমার কোনও নতুন খবর নেই—যথাপূর্বং।

—কী যেন একটা চাকরি করছিলি কোথায়?

—করছি। মরবার ইচ্ছে নেই যখন, তখন বেঁচে থাকতে হলে একটা কিছু করতে হবে।

দীপেন্দু হেসে উঠল। দীনগোপাল বললেন—একটা খবর দিয়ে

এলে স্টেশনে নবকে পাঠাতাম। তোমরা সব্বাই আমাকে ভুলে গেছ। একটা চিঠি পর্যন্ত না। কাজেই ধরে নিচ্ছি, এরিয়ায় কোম্পানির কোনও কাজে এসেছে।

দীপ্তেন্দু বলল—মোটেও না জ্যাঠামশাই! বিশ্বাস করুন, অনেক-দিন থেকে ভাবছিলাম আসব—তো সময় করাই কঠিন।

দীনগোপাল বললেন—নীতুও একই কৈফিয়ত দিয়েছে। যাই হোক, তোমরা এসেছ। আমার খুবই ভাল লাগছে। আগের মতো আর যখন তখন কলকাতা ছুটতে পারি না। চোখে ছানি। শরীরটাও

কে ওখানে?

হঠাৎ এমন গলায় কথাটা বলে উঠলেন, প্রথম নীতা এসে যে চমক খাওয়া তীব্র চিৎকার শুনেছিল, সেই রকম। দীপ্তেন্দু ভীষণ চমকে উঠেছিল, নীতার মতোই। কিছু বলতে যাচ্ছিল, দীনগোপাল নিজেই ফের আস্তে বললেন—কিছু না।

দীপ্তেন্দু নীতার দিকে তাকালে নীতা চোখ টিপল। দীপ্তেন্দুর দৃষ্টিতে বিস্ময় ছিল। বেড়ে গেল। দীনগোপাল লনে হাঁটতে হাঁটতে বললেন ফের—ও মাসে শান্ত চিঠি লিখেছিল। কিন্তু ঠিকানা ছিল না। অবশ্যি ওর তো বরাবর এরকম। ভবঘুরে স্বভাব হলে যা হয়।

দীপ্তেন্দু বলল—শান্তর সঙ্গে সেদিন দেখা হয়েছিল। রাস্তায়।

দীনগোপাল তার কথায় কান দিলেন না। বললেন—তুমি তো মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভ?

—হ্যাঁ, কেন জ্যাঠামশাই?

—ওষুধপত্তরের খবরাখবর তুমি রাখো। দীনগোপাল দাঁড়িয়ে গেলেন।—বিনা অপারেশনে ছানি সারানোর কোনও ওষুধ নেই?

দীপ্তেন্দু হাসল।—ও নিয়ে ভাববেন না। আমি ব্যবস্থা করে দেব'খন। বলুন, কবে যাচ্ছেন?

দীনগোপাল আস্তে বললেন—এখানকার ডাক্তার বলেছে, এখনও ম্যাচিওর করেনি। বুঝি না! এক হোমিওপ্যাথকে দেখলাম কিছুদিন।

সে আবার বলে, ছানি-টানি নয়। ঠাণ্ডা লেগে ইনফেকশান। শেষে
—কে ওখানে ?

দীপ্তেন্দু আবার চমকে উঠেছিল। কিছু বলতে যাচ্ছিল, নীতার ইশারায় চুপ করল। দীনগোপাল বাঁদিকে ঘুরে লনের ওধারে ভাঙা পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে আছেন। এই সময় বাড়ির আলোগুলি জ্বলে উঠল। দীনগোপাল সামনে বারান্দার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। ডাকলেন—নব !

—আজ্ঞে ! বারান্দা থেকে সাড়া দিল নব।

—চা। দীনগোপাল বারান্দায় উঠে বললেন—আর ইয়ে, দীপুর থাকার জন্য পুবের ঘরটা খুলে দে।

নব বলল—দিয়েছি। দাদাবাবু এলে তো ওই ঘরেই থাকেন।

ডাইনে সিঁড়ি দিকে এগিয়ে গেলেন দীনগোপাল।—আমার চা ওপরে পাঠিয়ে দে। আর দীপু, তোমারা গপ্পটপ্প করবে তো করো কিছুক্ষণ।

ওপরে-নিচে ছ'খানা ঘর। নিচের মধ্যিখানের ঘরটা বড় এবং সেটাই সাবেকি ড্রইংরুম। ভেতরে ঢুকে বাঁদিকের ঘরে গিয়ে ঢুকল দীপ্তেন্দু ও নীতা। দীপ্তেন্দু খাটে বসে সিগারেট জ্বালল। নীতা একটু তফাতে চেয়ারে বসে বলল—হঠাৎ চলে এলে যে !

—আর তুই ?

—আমিও অবিশ্যি তাই। নীতা আঙুল মটকাতে থাকল।—তবে বিনি খরচায় সাইট-সিইং। একঘেয়েমি দূর করা। অনেক কৈফিয়ত দিতে পারি। তবে—

দীপ্তেন্দু ধোঁয়ার রিং পাকিয়ে রিংটা দেখতে দেখতে বলল - একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে, জানিস ?

নীতা একটু চমকে উঠল—কী ?

দীপ্তেন্দু খুব আস্তে বলল—কাল বিকেলে তোর বউদি স্কুল থেকে বেরিয়ে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় একটা লোক ওকে জিগ্যেস করেছে, ও আমার স্ত্রী কিনা। তারপর বলছে, আপনার

স্বামীকে বলবেন, সরডিহিতে ওর যে জ্যাঠামশাই থাকেন, তাঁর সাংঘাতিক বিপদ ঘটতে চলেছে। তোর বউদিকে তো জানিস। বাড়ি ফিরে আমাকে প্রায় ঠেলে বের করে দিল। এক্ষুণি গিয়ে দেখ কী ব্যাপার।

নীতা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে শুনছিল। শ্বাস ছেড়ে বলল—আশ্চর্য! আমারও একই ব্যাপার।

—বল্।

—বাসস্টপে একটা লোক—

—বলল সরডিহিতে জ্যাঠামশায়ের বিপদ?

—হুঁ। নীতা আনমনে বলল।—লোকটার মুখে দাড়ি ছিল। আর—

—চোখে সানগ্লাস?

—তাই। আমি ওকে চার্জ করতে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা বাস এসে পড়তেই লোকটা সেই বাসে উঠে নিপাত্তা হয়ে গেল। তাছাড়া বাসস্টপের জায়গাটায় আলো ছিল না। ফিসফিসিয়ে কথাটা বলেই কেটে পড়েছিল।

দীপ্তেন্দু একটু চুপ করে থাকার পর বলল—তুই জ্যাঠামশাইকে একথা বলেছিস?

—না। আমি এসেছি গত পরশু। বলল-বলব করে ছুটো দিন কেটে গেল। আসলে জ্যাঠামশাইকে তো জানো। আনপ্রেডিক্টেবল ম্যান। কীভাবে রিঅ্যাক্ট করবেন, কে জানে। কিন্তু আমি আসার পর—

নীতা থেমে গেল। নব ট্রেতে চায়ের পট আর কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল। বড় প্লেটে কিছু চানাচুর, বিস্কুট আর কয়েকটা সন্দেশ। সে কথা বলে কম। টেবিলে ট্রে রেখে বেরিয়ে গেল। দীপ্তেন্দু বলল-হুঁ বল্।

নীতা বলল-ব্যাপারটা তুমিও লক্ষ্য করেছ একটু আগে। জ্যাঠামশাই যখন তখন 'কে ওখানে' বলে উঠছেন। পরশু বিকেলে আমি

আসার একটু পরে পাঁচিলের কাছে একটা ঝোপের দিকে তাকিয়ে জ্যাঠামশাই চেঁচিয়ে উঠেছিলেন 'কে ওখানে?' আমি তখনই দৌড়ে গেলাম। কাউকে দেখতে পেলাম না! কিন্তু একখানে লক্ষ্য করলাম ঘাসগুলো সবে সোজা হচ্ছে। তার মানে সত্যিই কেউ ওখানে ছিল। ফিরে গিয়ে বললাম, শেয়াল বা কুকুরটুকুরও হতে পারে। জ্যাঠামশাই নিজেও অবশ্যি বলেছেন 'হ্যালুসিনেশান'। একটা চোখ ছানির জন্য নাকি ভুল দেখেছেন।

দীপ্তেন্দু একমুঠো চানাচুর তুলে নিয়ে বলল-কিছুবোঝা যাচ্ছে না। তবে আমার মনে হয়, বাসস্টপের লোকটার কথা ওঁকে বলা দরকার। চা খেয়ে নে। তারপর চল্, দুজনে গিয়ে বলি।

এই সময় বাইরে কাছাকাছি গাড়ির প্রিঁ প্রিঁ এবং গরগর শব্দ হলো। নীতা উঠে গিয়ে উত্তরের জানালাটা খুলে দিলে একঝলক তীব্র আলো এসে ঢুকল। দীপ্তেন্দুও উঠে দেখতে গেল।

নব গেট খুলে দিলে একটা জিপ ঢুকল প্রাঙ্গণে! নীতা বলল-অরুদা! সঙ্গে বউদিও এসেছে।

- অরুণ? বলে বেরিয়ে গেল দীপ্তেন্দু।

অরুণ ডাকছিল—জ্যাঠামশাই! জ্যাঠামশাই!

ওপরের ঘরের জানালা থেকে দীনগোপাল সাড়া দিলেম। অরুণ হইহই করে উঠল। - দীপু! আরে নীতা যে! কী অবাক, কী অবাক!

অরুণের বউ ঝুমা এসে নীতাকে জড়িয়ে ধরল।—ইশ! কত্তোদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হলো!

নীতা বলল-তুমি বড্ড বেশি মুটিয়ে গেছ বউদি!

ঝুমা দীপ্তেন্দুর দিকে চোখের ঝিলিক তুলে বলল-- আশাকরি, দীপুর বউয়ের টোয়েন্টি প্যার্সেন্টর বেশি নয়। দেখে তো প্রথমে চিনতেই পারিনি। দীপু ওষুধের ব্যাপারটা ভাল বোঝে! নিশ্চয় কোনও ট্যাবলেট খাওয়ায়, যাতে বেচারা আরওমোটা হতে হতে শেষে ঘরবন্দি হয়ে ওঠে এবং দীপুর পরকীয়া প্রেমের—সরি! ঝুমা জিভ কেটে থেমে গেল।

দীনগোপাল নেমে এসেছিলেন। অরুণ ও ঝুমা প্রণাম করলে বললেন—এবার শান্তটা এসে পড়লে দারুণ হয়! তিনি হাসছিলেন। মুখে খুশির ঝলমলানি। তারপর হাঁকলেন - নব!

—আজ্ঞে!

—এদের ওই ঘরটা খুলে দে। দ্যাখ্, পরিষ্কার আছে নাকি। বিছানা বদলে দিবি। আর ইয়ে—আগে চা-টায়ের ব্যবস্থা। অরু, তোরা দীপুর ঘরে গিয়ে বসতে পারিস ততক্ষণ। কিছুক্ষণ পরে তোদের নিয়ে বসব।

দীনগোপাল আবার ওপরে চলে গেলেন। নব বিশাল লন পেরিয়ে গেটে তালা বন্ধ করতে গেল। সওয়া পাঁচটাতেই সন্ধ্যা ঘন হয়ে উঠেছে। বারান্দায় সিঁড়ির নিচে অরুণের গাড়িটার ওপর হলুদ আলোর ঝলক হিংস্র দেখাচ্ছে যেন। দীপ্তেন্দুর ঘরে এসে অরুণ প্রথমে সন্দেশগুলোকে গিলতে শুরু করল। তার ফাঁকে নীতাকে হুকুমও দিল।—পটে আশা করি এখনও যথেষ্ট চা আছে। মেয়েদের চা খেতে নেই। দীপ্ আর আমি ভাগ করে খাব। তারপর ফের চা এলে আগে ফের দুজনে—হুঁ, বাকিটা তোমরা দুজনে। কেমন? আর এর একমাত্র লজিক হলো, পুরুষেরা সব কিছুতে আগে এবং মেয়েরা পরে। সনাতন শাস্ত্রীয় প্রথা।

ঝুমা চোখ পাকিয়ে বলল—ইউ টক টু ম্যাচ। থামো তো। সব সময় খালি—

অরুণ বলল—ওকে। কথা কম, কাজ বেশি।

সে খাবারগুলো একা শেষ করছিল। নীতা তার হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে দিয়ে আস্তে বলল—তোমাদেরও কি বাসস্টপে একটা লোক—

অরুণ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—ঝুমা! এবার বোঝ তাহলে। হুঁ—বাসস্টপে একটা লোক। দ্যাটস রাইট, নীতা!

দীপ্তেন্দু প্রথমে অরুণের দিকে, তারপর ঝুমার দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে বিস্ময় ঝিকমিক করছিল। নীতা কথাটা ঠাট্টা করে বলেছিল!

কিন্তু এবার সে গম্ভীর হয়ে গেল। দীপ্তেন্দুর হাতে চা দিয়ে বলল—মনে হচ্ছে গোটা ব্যাপারটা একটা হোক্স। শান্তদার কাণ্ড।

ঝুমা বলল—সেটা ওকে বোঝাও। সবতাতেই হইহই খালি।

অরুণ খাটে বসে বলল—হোক্স হোক আর ফোক্স হোক, এমন একটা চমৎকার জার্নি আর এক্সকার্সানের জন্য লোকটাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। সরডিহি এলে, বিলিভ মি, নতুন করে ভাইটালিটি পাই। ঝুমা ভিটামিনের কথা বলছিল। সরডিহি আস্ত ভিটামিন! এ বি সি ডি ই—

তাকে থামিয়ে নীতা বলল—বাসস্টপের লোকটার কথা বলো।

—কথা কম, কাজ বেশি। অরুণ একই মেজাজে বলল।—বাসস্টপে একটা দেড়েল লোক, চোখে কালো চশমা। সে কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বলল, গো অ্যাট ওয়ান্স টু সরডিহি। ইওর জ্যাঠামশাই ইজ ইন ডেঞ্জার। তারপর হাওয়া!

দীপ্তেন্দু বলল, আরও একটু আছে। নীতা তুই বল্।

নীতা একটু হাসল।—এটা অবিশ্যি জ্যাঠামশাইয়ের নতুন বাতিক হতেও পারে। সব সময় দুয়ে-দুয়ে যোগ করে চার হওয়ার মতো ব্যাপার ঘটে না।

অরুণ বলল—গো অন!

—আসা অব্দি দেখছি, জ্যাঠামশাই খালি 'কে ওখানে' বলে চমকে উঠছেন। নীতা গলার স্বর নামিয়ে বলল।—শেষে নিজেই বলছেন হ্যালুসিনেশান। আমারও তাই মনে হচ্ছে। চোখের গণ্ডগোলের জন্য ভুলভাল দেখছেন।

দীপ্তেন্দু বলল—কিন্তু তুই বললি, ঘাসগুলো—

অরুণ দ্রুত বলে উঠল—ঘাসগুলো! ঝুমা, তোমাকে বলছিলাম সরডিহিতে নেচার কথা বলে। নেচার স্পিকস টু ম্যান। ঘাস ইজ আ পার্ট অব নেচার। সো ঘাস স্পিকস টু ম্যান!

ঝুমা চোখ পাকিয়ে তাকালে সে থেমে গেল। নীতা জ্যাঠামশাইয়ের চিৎকার এবং পাঁচিলের কাছে ঘাসগুলোর সোজা হওয়ার ঘটনাটি এবার

একটু রহস্য মিশিয়ে বর্ণনা করল। শোনার পর অরুণ মন্তব্য করল—জ্যাঠামশাইকে একটা অ্যালসেসিয়ান পোষার কথা বলব।

নব আবার চা এবং কিছু খাবার আনল। সে চলে যাচ্ছে, এমন সময় অরুণ তাকে ডাকল—নব, শোনো!

নব একগাল হেসে বলল—মুর্গির মাংস খাবেন তো? সে ব্যবস্থা করেই রেখেছি।

—ধুস! অরুণ হাসল। কী বলব না শুনেই মুর্গি ছেড়ে দিল!

ঝুমা বলল—এসেই তো মুর্গির পালে হানা দাও। ওর দোষ কী?

অরুণ সায় দেবার ভঙ্গি করে বলল—দিই। কারণ সরডিহির মুর্গি অতি সুস্বাদু। তবে নবকে আমি এখন অন্য কিছু বলতে চাই। প্লিজ ডোণ্ট ইণ্টারফিয়ার! আচ্ছা, নব!

নব বিনীতভাবে বলল—বলুন দাদাবাবু!

—ইদানিং তোমার কর্তাবাবু, মানে আমাদের জ্যাঠামশাই নাকি দিন দুপুরেও ভূত দেখতে পাচ্ছেন?

—আজ্ঞে। নব সায় দিয়ে বলল। -যখন তখন। বুঝলেন দাদাবাবু? যখন তখন খালি কাউকে দেখছেন। আর এদিকে আমার হয়েছে যত জ্বালা। সব ফেলে বাড়ির চার তল্লাট খুঁজে হন্যে হচ্ছি। শেষে দিদি এসে একটু হুলুস্থুলু থেমেছে মনে হচ্ছে।

দীপ্তেন্দু বলল—থেমেছে কোথায়?

নব একটু হাসল।—তা অনেকটা থেমেছে, আজ্ঞে। চ্যাঁচামেচি কমেছে। অন্তত রাতবিরেতে আর গণ্ডগোল করছেন না।

অরুণ বলল—কতদিন থেকে ভূত দেখছেন জ্যাঠামশাই?

নব একটু ভেবে এবং হিসেব করে বলল—তা প্রায় সপ্তাটাক হবে। দুপুর রাত্তিরে প্রথম হুলুস্থুলু—'কে ওখানে' কে ওখানে' করে চ্যাঁচামেচি। টর্চ আর বল্লম নিয়ে বেরুলাম। বস্তি থেকে লোকেরাও দৌড়ে এল। কিন্তু কোথায় কী? শেষে বাবুমশাইকে বললাম, থানায় খবর দিয়ে রাখা ভাল। তখন বললেন, আমারই চোখের ভুল। চোখে ছানি পড়লে নাকি এমন হয়।...

নব চলে গেলে নীতা বলল—কিন্তু বাসস্টপের ব্যাপারটার ব্যাখ্যা কী ?

ঝুমা বলল—তুমিই তো বললে, শান্ত সবাইকে নিয়ে একটা জোক করছে হয়তো।

অরুণ চোখ বুজে বলল—গো অন বেবি ! এক্সপ্লেন !

ঝুমা মুখ টিপে হাসল—দেখবে, কালই শান্ত এসে পড়বে। আসলে ও আমাদের সবাইকে এখানে জড়ো করতে চাইছে।

নীতা ভুরু কুঁচকে বলল—কিন্তু কেন ?

—অনেকদিন একসঙ্গে সবাই মিলে সরডিহিতে হইহুল্লোড় করতে আসা হচ্ছে না, তাই।

দীপ্তেন্দু বলল—ঠিক আছে। কিন্তু বাসস্টপের লোকটা কে ?

—হয়তো ওর কোনো বন্ধু। নীতা রহস্য ফাঁস করার ভঙ্গিতে বলল।—শান্তদাকে তো চেনো। ওর মাথায় অদ্ভুত অদ্ভুত প্ল্যান গজায়।

এবার পরিবেশ হাল্কা হয়ে এসেছিল। ওরা চা খেতে খেতে নানা ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে থাকল। কিছুক্ষণ পরে নব এসে খবর দিল কর্তাবাবু সবাইকে ওপরের ঘরে ডাকছেন। ওরা দীনগোপালের ঘরে গেল।

দোতালায় পূবদিকের ঘরটাতে দীনগোপাল থাকেন। ঘরটা খুবই অগোছাল। একটা সেকেলে প্রকাণ্ড খাট। তার ওপর বইপত্তর, আরও টুকিটাকি জিনিস। একটা স্যুটকেস পর্যন্ত। দেয়াল ঘেঁষে কয়েকটা কাঠ আর স্টিলের আলমারি। কোণার দিকে টেবিল এবং একটা গদি আঁটা চেয়ার। দেয়ালে বেরঙা কয়েকটা ফোটো আর বিলিতি পেন্টিং। একটা সেকেলে ড্রেসিং টেবিলও আছে। নব কয়েকটা হাল্কা বেতের চেয়ার এনে দিল। দীনগোপাল গম্ভীর মুখে খাটে ডাঁই-করা বালিশে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন।

সবাই বসলে দীনগোপাল বললেন—তোমরা এসেছ, আমার খুব ভাল লাগছে। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার একটু খটকা বেঁধেছে।

সেটা হলো, তোমরা যে যখনই এসেছ, আগে খবর দিয়েছ। না-কেউ কেউ খবর না দিয়েও অবিশ্যি এসেছ। কিন্তু এভাবে প্রায় একই সঙ্গে এবং খবর না দিয়ে এসে পড়ার মধ্যে কী যেন একটা লিংক আছে।

অরুণ মুচকি হেসে বলল—আছে। এতক্ষণ আমরা সেই নিয়েই আলোচনা করছিলাম।

দীনগোপাল সোজা হয়ে বসে বললেন—কী লিংক্? কেউ কি তোমাদের খবর দিয়েছে আমি মৃত্যুশয্যায়?

কথাটার মধ্যে কিছু রূঢ়তা ছিল। তাই পরস্পর মুখ তাকাতাকি করল ওরা। তারপর নীতা বলল—দোষটা আমারই, জ্যাঠামশাই! এসেই আপনাকে কথাটা বলা উচিত ছিল। কিন্তু বলিনি!

অরুণ ঝটপট বলল—আঃ! এত লুকোচুরির কী আছে? আমি বলছি জ্যাঠামশাই! পুরো ব্যাপারটা শান্তর জোক।

দীনগোপাল বিরক্ত মুখে বললেন—শান্ত বলেছে আমি মৃত্যুশয্যায়?

জিভ কেটে দীপ্তেন্দু বলল—ছি, ছি! এ কী বলছেন জ্যাঠামশাই! আমরা কি কেউ আপনার প্রপার্টির লোভে—

তাকে থামিয়ে অরুণ বলল—তুমি চুপ করো তো দাদু! জ্যাঠামশাই, শান্তকে তো জানেন—বরাবর এরকম জোক করে। এবার করেছে কী, ওর এক বন্ধুকে দিয়ে আমাদের প্রত্যেককে খবর দিয়েছে, তোমার জ্যাঠামশাইয়ের খুব বিপদ। হি ইজ ইন ডেঞ্জার। গো এ্যাণ্ড প্রোটেক্ট হিম।

দীনগোপাল কান খাড়া করে শুনছিলেন। বললেন—আমার বিপদ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কী বিপদ?

অরুণ একটু ইতস্তত করে বলল—সেটা তো বলেনি! কিন্তু এসে নীতার মুখে যা শুনলাম, তাতে মনে হলো, সত্যি যেন কী ঘটতে চলেছে। অবশ্যি আপনার চোখের অসুখ হয়েছে শুনলাম। নিজেও নাকি হ্যালুসিনেশান দেখার কথা বলেছেন।

দীনগোপাল হাসবার চেষ্টা করে বললেন—তাহলে তোমরা আমাকে প্রোটেকশান দিতে এসেছ ?

দীপ্তেন্দু বলল না। মানে, অরুণ তো বলল, ব্যাপারটা শান্তর জোক। আলোচনা করে আমরা সিদ্ধান্তে এসেছি, শান্তর শীগগির এসে পড়ার সম্ভাবনা আছে। আসলে অনেকদিন আমরা একসঙ্গে সরডিহিতে এসে হইহল্লা করিনি।

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দীনগোপাল বললেন—বুঝতে পেরেছি।

অরুণ বলল—কিন্তু এবার আপনার ওই হ্যলুসিনেশান দেখার ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার হলে ভাল হয়, জ্যাঠামশাই !

দীনগোপাল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন—চোখের অসুখের জন্য কিনা জানি না। কিছুদিন থেকে হঠাৎ হঠাৎ এটা ঘটছে। ঝোপজঙ্গল বা গাছপালার আড়ালে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি !

—চেহারার ডেসক্রিপশান দিন। অরুণ গম্ভীর চালে বলল।

হাসলেন দীনগোপাল : —কী ডেসক্রিপশান দেব ? নিছক ছায়ামূর্তি।

—আহা, মানুষ তো ?

—হ্যাঁ। মানুষের মতোই। কিন্তু আবছা চেহারা। আমি কিছু বলতেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। নীতাকে জিগ্যেস করো।

দীপ্তেন্দু বলল নীতা বলেছে। ঘাসে কেউ দাঁড়িয়েছিল। জন্তুজানোয়ার হওয়াই সম্ভব।

দীনগোপাল গম্ভীর মুখে বললেন—কিন্তু আমি সেখানে আবছা মানুষের মূর্তিই দেখেছিলাম।

নীতা জোর দিয়ে বলল—মানুষ হলে পালাবে কোন পথে ? পাঁচিলের ভাঙা জায়গাগুলোয় তো কাঠের শক্ত বেড়া। বড়জোর একটা শেয়াল বা কুকুর, তাও অনেক কষ্টে গলে যেতে পারে।

দীনগোপাল অন্যমনস্কভাবে খাটের কোণার দিকে জানালায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তারপরই দ্রুত ঘুরে চেঁচিয়ে উঠলেন—কে ওখানে ?

আচমকা এই চেঁচানিতে সবাই প্রথমে হকচকিয়ে উঠেছিল। তারপর অরুণ একলাফে বাইরে বারান্দায় চলে গেল। ওদিকটা দক্ষিণ এবং বারান্দার মাথায় একটা চল্লিশ ওয়াটের বাল্ব জ্বলছে। আবছা হলুদ খানিকটা আলো নিচে গিয়ে পড়েছে। ঝোপঝাড়, ঘাসে ঢাকা মাটি। সে হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে চলে গেল। তাকে অনুসরণ করল দীপ্তেন্দু। দীনগোপাল বললেন · হ্যালুসিনেশান! কিন্তু ওরা গ্রাহ্য করল না। ঝুমা উত্তেজিতভাবে বারান্দায় গেল। তার পেছনে নীতা। দুজনেই দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে নিচের দিকে তাকিয়ে রইল।...

একটু পরে নিচে টর্চের আলো ঝলসে উঠল। অরুণের গলা শোনা গেল—দীপু তুমি ওদিকটায় যাও।

নবরও সাড়া পাওয়া গেল—কিছু না দাদাবাবু! খামোকা ছুটোছুটি করে লাভ নেই।

অরুণ বলল—শাট আপ! কাম অন উইথ ইওর বল্লম! হাথিয়ার লে আও জলদি!

দীপ্তেন্দুর হাতেও টর্চ। সে পূর্বদিক ঘুরে আলো ফেলতে ফেলতে উত্তরে গেটের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বাড়ির পশ্চিমদিক থেকে অরুণের চিৎকার ভেসে এল—দীপু! দীপু! ধরেছি—ধরে ফেলেছি ব্যাটাকে।

দীপ্তেন্দু দৌড়ে সেদিকে চলে গেল। নব একটা বল্লম হাতে বেরুল এতক্ষণে।

টর্চের আলোয় দীপ্তেন্দু হতভম্ব হয়ে দেখল, অরুণকে ধরাশায়ী করে তার ওপর বসে আছে গাব্দাগোব্দা প্রকাণ্ড একটা গুঁফো লোক। পরনে প্যান্ট, গলাবন্ধ কোট, গলায় মাফলার জড়ানো। দীপ্তেন্দু থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

নব বল্লম তাক করেছিল। সেও থেমে গেছে।

দীপ্তেন্দু হো হো করে হেসে ফেলল।—কী অদ্ভুত কাণ্ড!

—অদ্ভুত তো বটেই! বলে গুঁফো লোকটি উঠে দাঁড়ালেন।—

হতভাগাকে বারবার বলছি, হাতে টর্চ—ভাল করে ভাখ.কে আমি। কথায় কান করে না! অ্যাই অরুণ! ওঠ্! নাকি ভিরমি খেলি?

দীপ্তেন্দু বলল—মামাবাবু, একটা কাণ্ড করলেন বটে!

—আমি করলাম, না অরুণ করল, তাই ভাখ্!

অরুণ পিটপিট করে তাকাচ্ছিল। উঠে বসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—কোনও মানে হয়?

—হয়। তোর মাথাটা বরাবর মোটা। নে—ওঠ্!

অরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—সদর গেট রয়েছে। দিব্যি সেখান দিয়ে আসতে পারতেন! খামোকা আমাকে হ্যারাস করার জন্য লুকোচুরি খেলা। বরাবর আপনার এই উদ্ভুটে কারবার।

দীপ্তেন্দু হাসতে হাসতে বলল—আপনি পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকেছিলেন নাকি? পারলেন?

গুঁফো ভদ্রলোক বললেন—পলিটিকাল লাইফে জেলের পাঁচিল টপকে পালিয়ে নিউজ হয়েছিলাম, ডোণ্ট ফরগেট ভাট। দীনুদার বাড়ির পাঁচিল না আঁচিল!

তারপর অরুণের কাঁধে হাত রেখে মুচকি হাসলেন।—অনেক কাল আগে জুডো শিখেছিলাম। দেখা গেল, ভুলিনি। আয়. দীনুদা কী অবস্থায় আছে দেখি। ওর বিপদের খবর পেয়েই তো আসা। আমার স্বভাব তো জানিস!

অরুণ গুম হয়ে বলল—জানি! গোয়েন্দাগিরি। তা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলে বসলেই পারেন!

'মামাবাবু' প্রভাতরঞ্জন পা বাড়িয়ে বললেন আমার পুরো প্ল্যানটা তুই ভেস্তে দিলি। ভেবেছিলাম কয়েকটা রাত্তির চুপিচুপি এসে ঘাপটি পেতে বসে থাকব এবং দীনুদার ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলব। হলো না। এদিক যে হোটেলে উঠেছি, সেখানে রাত্তিরে আজ পাঁঠার ঝোলের খবর আছে। জানিস তো, আমি ভয়ংকর আমিষাশী রাক্ষস।

দীপ্তেন্দু বলল—আচ্ছা মামাবাবু, আপনি কীভাবে জানলেন—

যে—তার কথার ওপর অরুণ বলল—বাসস্টপে একটা লোক তো ?

প্রভাতরঞ্জন থমকে দাঁড়িয়ে বললেন– মাই গুডনেস ! তুই কী করে জানলি ?

যেতে যেতে দীপ্তেন্দু সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানাল। শান্তর জোকের সম্ভাবনাটাও উল্লেখ করল। প্রভাতরঞ্জন আনমনে বললেন—তাও বিচিত্র নয়। যাই হোক, শান্ত সত্যি এসে পড়লে এর মীমাংসা হবে। যতক্ষণ সে না আসছে, ততক্ষণ ব্যাপারটা হেঁয়ালি থেকে যাচ্ছে।···

ওপরে দীনগোপাল ততক্ষণে নীতা ও ঝুমার মুখে ঘটনাটা জানতে পেরেছেন। প্রভাতরঞ্জন সদলবলে ঘরে ঢুকলে ছড়ি তুলে হাসতে হাসতে বললেন—এসো। আগে এক ঘা খাও, তারপর কথা।

প্রভাতরঞ্জন মাথা নিচু করে বললেন মারো তাহলে।

দীনগোপাল হাত বাড়িয়ে তাঁকে টেনে কাছে বসালেন।—আশা করি তুমিও বাসস্টপে কোনও লোকের মুখে আমার বিপদের খবর শুনে গোয়েন্দাগিরি করতে আসোনি !

প্রভাতরঞ্জন কিছু বলার আগেই অরুণ বলে উঠল—হ্যাঁ জ্যাঠা-মশাই, দা সেইম কেস।

ঘরে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে নব আরেক প্রস্থ চা দিয়ে গেল। চা খেতে যেতে শান্তর কথা উঠল। প্রভাতরঞ্জন বললেন—শান্তর সঙ্গে মাসখানেক আগে কলেজ স্ট্রীটে দেখা হয়েছিল। বলল, বিয়ে করেছে। বউকে নিয়ে প্রণাম করতে যাবে। যায়নি।

নীতা চমকে উঠেছিল।—শান্তদা বিয়ে করেছে ? অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি না।

দীপ্তেন্দু বলল—আমিও না।

অরুণ বলল—আমিও।

ঝুমা বলল—ভ্যাট ! ও বিয়ে করবে কী ? ও তো কোন ব্রহ্ম-চর্যাশ্রমে যেত-টেত শুনেছিলাম।

প্রভাতরঞ্জন হাসলেন।—তোমরা ভাবলে আমি ওর কথা বিশ্বাস করেছিলাম ? নেভার।

অরুণ একটু কিন্তু-কিন্তু ভঙ্গি করে বলল—অবশ্যি, ওর পক্ষে অসম্ভব কিছু নেই। জ্যাঠামশাই, প্লিজ অন্যভাবে নেবেন না। ওর মধ্যে আপনার খানিকটা আদল আছে। আমাদের বংশের যদি কোনও বিশেষ লক্ষণ থাকে, সেটা খানিকটা আপনার আর শান্তর মধ্যেই আছে। আমার কথা না, বাবাই বলতেন।

দীনগোপাল একটু হেসে বললেন—কী সেই লক্ষণ?

—জেদ। বলেই অরুণ হাত নাড়তে লাগল।—না, না। কদর্থে বলছি না, সদর্থে। ইট ইজ জাস্ট্ লাইক-টু স্টিক টু আ পয়েণ্ট। যা ভাল বুঝেছি, তাই করব—এরকম আর কী!

দীনগোপালের হাতে সেই ছড়িটা তখনও আছে। খেলার ভঙ্গিতে নাড়াচাড়া করতে করতে আনমনে বললেন—কোন পয়েণ্ট স্টিক করে আছি, আমি নিজেই জানি না। আর জেদের কথা যদি ওঠে কিসের জেদ?

প্রভাতরঞ্জন বললেন—দীনুদা, ভয়ে বলি কী নির্ভয়ে বলি?

—নির্ভয়ে। দীনগোপাল একটু হাসলেন।

প্রভাতরঞ্জন বললেন—একা এই সরডিহিতে পড়ে থাকা, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, বিয়ে করোনি। নাম্বার থ্রি...

বলে প্রভাতরঞ্জন হঠাৎ থেমে মুখে যথেষ্ট গাম্ভীর্য আনলেন। কথাটা গুছিয়ে বলতে চান এমন একটা হাবভাব। অরুণ সেই ফাঁকে বলে উঠল—হ্যালুসিনেশানের প্রাথমিক লক্ষণ ধরা পড়েছে। অথচ গা করছেন না। সাইকোলজির বইতে পড়েছি, এ একটা সাংঘাতিক অসুখ। অথচ গ্রাহ্য করছেন না। এও একটা জেদ।

ঝুমা স্বামীকে যথারীতি ধমকের সুরে বলল—থামো তো! হাতেনাতে প্রমাণ পেলে, হ্যালুসিনেশান নয়। মামাবাবুকে জানালা দিয়ে দিব্যি দেখতে পেলেন। কিসের হ্যালুসিনেশান?

প্রভাতরঞ্জন হাত তুলে বললেন—চুপ! নাম্বার থ্রি, উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপন। সব মানুষেরই মোটামুটি একটা লক্ষ্য থাকে। দীনুদার ছিল না এবং এখনও যা দেখছি, নেই।

দীনগোপাল ঈষৎ কৌতুকে বললেন – লক্ষ্য ব্যাপারটা কী?

—লক্ষ্য দুরকমের। প্রভাতরঞ্জন ভারিক্কি চালে বললেন। বৈষয়িক এবং মানসিক। বৈষয়িক লক্ষ্য কী, আশা করি বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। মানসিক লক্ষ্য বলতে ঐহিক আর পারলৌকিক, উভয়ই। ধরো, কেউ সমাজসেবা করে। আবার কেউ ঈশ্বরে মন-প্রাণ সমর্পণ করে।

দীনগোপাল আস্তে বললেন—ঈশ্বরটিশ্বর বোগাস। আর সমাজসেবার কথা বলছ! সেও একটা লোক-দেখানো ভড়ং। এই যে একসময় তুমি রাজনীতি করে বেড়াতে। জেল খেটেছ। কাগজে নাম ছাপা হয়েছিল। কিন্তু তারপর?

—তারপর আবার কী? প্রভাতরঞ্জন উজ্জ্বল মুখে বললেন। …স্যাটিসফ্যাকশান! চিত্তের সন্তোষ। এটা জীবনে কম নয়, দীনুদা! একটা মহৎ কাজ করার তৃপ্তি। তাছাড়া জীবনের একটা মানেও তো আছে!

দীনগোপাল একই সুরে বললেন—ওসব আমি বুঝি না। তোমার জেল খাটায়—হ্যাঁ, তুমি একবার জেল থেকে পালিয়েও ছিলে, ভাল কথা—কিন্তু এতে কার কী উপকার হয়েছে বুঝি না। পৃথিবী বড়ো ব্যাপার—এই দেশটার কথাই ধরো। দিনে দিনে কী অবস্থাটা হচ্ছে! বাসের অযোগ্য একেবারে। নরক!

প্রভাতরঞ্জন অট্টহাসি হেসে বললেন—সিনিক! সিনিক! এক্কেবারে সিনিসিজম!

অরুণ বলল—শান্ত! অবিকল শান্তর কথাবার্তা।

—তাও তো শান্তর ব্যাপারটা বোঝা যায়। প্রভাতরঞ্জন বললেন। শান্ত, ওই যে কী বলে, উপগ্রন্থী রাজনীতি করত। আমার সঙ্গে একবার সে কী এঁড়ে তর্ক! যাই হোক, ঘা খেয়ে ঠকে শেবে শিখল। কিন্তু তোদের এই জ্যাঠামশাই ভদ্রলোকের ব্যাপারটা ভেবে দ্যাখ! কী দীনুদা? খুব চটিয়ে দিচ্ছি, তাই না?

হাসলেন দীনগোপাল। —তোমার তো চিরকাল ওই একটাই

কাজ। লোককে চটানো। কিন্তু আমি পাথুরে মানুষ।

নীতার এসব কথাবার্তা ভাল লাগছিল না। সে ঝুমাকে ছুঁয়ে চোখের ইশারা করল, বারান্দায় গিয়ে গল্প করবে। ঝুমা বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়াল। অরুণ মুচকি হেসে বলল—সরডিহিতে প্রচুর ভূত আছে। সাবধান!

ততক্ষণে ঝুমা ও নীতা বারান্দায়। অরুণের কথা শেষ হবার পর তুজনে এক গলায় চেঁচিয়ে উঠল—কে, কে?

শোনামাত্র প্রথমে প্রভাতরঞ্জন একটা হুংকার ছেড়ে দরজার দিকে ঝাঁপ দিলেন। অরুণ ও দীপেন্দু তাঁর পেছনে গিয়ে হাঁক ছাড়ল—কোথায়, কোথায়?

তারপরই ঝুমা ও নীতার হাসি শোনা গেল। প্রভাতরঞ্জন, দীপেন্দু ও অরুণের মুখের আক্রমণাত্মক ভাব অদৃশ্য হলো। অরুণ বলল—তাহলে যা ভেবেছিলাম!

দীনগোপাল ঘরের ভেতর থেকে বললেন—শান্ত নাকি?

—আবার কে? প্রভাতরঞ্জন সহাস্যে শান্তকে টানতে টানতে ঘরে ঢোকালেন।

শান্ত কেমন চোখে সবার দিকে তাকাচ্ছিল। দীনগোপাল ডাকলেন—আয় শান্ত! তখন সে দীনগোপালের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

অরুণ বলল—খুব জব্বর চালটা দিয়েছিস, শান্ত! তবে আমরা ড্যাম গ্ল্যাড।

শান্ত বলল—আমি সত্যি কিছু বুঝতে পারছি না। হঠাৎ তোমরা এখানে···

তার কথা কেড়ে দীপেন্দু বলল—ন্যাকামি করবি নে।

ঝুমা চোখে ঝিলিক তুলে বলল—ন্যাকামি মানে, বাসস্টপে একটা লোক।

অরুণ খ্যা খ্যা করে হেসে বলল—এবং মুখে দাড়ি, চোখে সানগ্লাস আমাদের সবাইকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

শান্তু আস্তে বলল—হ্যাঁ। কাল সন্ধ্যায় গড়িয়াহাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ ওরকম একটা লোক কাছে এসে চাপা গলায় বলল, আপনার সরডিহির জ্যাঠামশাই বিপন্ন। শীগগির চলে যান। তারপর কথাটা বলেই ভিড়ে মিশে গেল। এমন হকচকিয়ে গিয়েছিলাম যে, ওকে কিছু বলব বা চার্জ করব, সুযোগই পেলাম না।

প্রভাতরঞ্জন কান করে শুনছিলেন। একটু কেসে বললেন—শান্তু, আশা করি জোক করছ না?

—না। আর যেখানে করি, জ্যাঠামশাইয়ের ব্যাপারে আমি জোক করি না। বলে সে আঙুল খুঁটতে থাকল। মুখটা নিচু।

দীনগোপাল খুব গম্ভীর হয়ে চোখ বুজে ছিলেন। ঘরে স্তব্ধতা ঘন হয়েছিল, চিড় খেল তাঁর ডাকে—নব! নব—অ!···

## ॥ দুই ॥

সরডিহিতে দীনগোপালের এই বাড়িতে এর আগেও তাঁর ভাইপো ভাইঝিদের দঙ্গল এসে জুটেছে। হইহল্লা করছে! কিন্তু এবারকার আসা অন্যরকম। বিশেষ করে শান্তু এসে একই কথা বলায় প্রকাণ্ড একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। প্রভাতরঞ্জন নীতারই মামা। দীপ্তেন্দু, শান্তু, অরুণেরও অবশ্যই নিজ নিজ মামা আছেন। কিন্তু তারা অন্য ধরণের মানুষ। প্রভাতরঞ্জন অরুণের ভাষায় 'কমন মামা'। প্রাণবন্ত, হাসিখুশি আর বেপরোয়া মানুষ। গল্পের রাজা বলা চলে। অবিশ্যি 'গল্প' বললে চটে যান। বলেন, রিয়েল লাইফ স্টোরি। কিন্তু এবার কোনও 'রিয়েল লাইফ স্টোরি'-র আবহাওয়া ছিল না। সরডিহি বাজার এলাকায় যে হোটেলে উঠেছিলেন, সেখান থেকে বোঁচকা গুটিয়ে চলে এসেছিলেন। দীনগোপালকে পাহারার জন্য নিশ্ছিদ্র ব্যূহ রচনায় ব্যস্ত হয়েছিলেন। তবে সেটা দীনগোপালের অজ্ঞাতসারে। প্রভাতরঞ্জনের ধারণা, এই রাতেই

কিছু ঘটবে। যেহেতু শান্ত আসার পর আর কেউ এখানে আসার মতো নেই।

সুতরাং একটা প্রচণ্ড হিম ও কুয়াশা-ঢাকা রাত শুধু জেগে কাটানো নয়, মাঝে মাঝে বেরিয়ে চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা, ভুল কোনও নড়াচড়া দেখেই টর্চের আলো এবং ছুটোছুটি, এসবের মধ্যে কেটে গিয়েছিল। দীনগোপালের প্রতি প্রভাতরঞ্জনের নির্দেশ ছিল, কেউ ডাকলে দরজা যেন না খোলেন। দীনগোপাল একটু হেসে বলেছিলেন — আমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুই।

রাত চারটেয় কুয়াশা আরও ঘন হয়েছিল এবং প্রথমে নীতা ওপরে শুতে যায়। পরে অরুণ, তারপর দীপ্তেন্দু, শেষে শান্ত শুতে যায়। নিচের ড্রইংরুমে শুধু প্রভাতরঞ্জন একা জেগে ছিলেন। হাতে টর্চ এবং নবর সেই বল্লম।···

অভ্যাসমতো ভোর ছটায় উঠে দীনগোপাল গলাবন্ধ কোট, মাথায় হনুমান টুপি, পায়ে উলের পুরু মোজা ইত্যাদি পরে এবং হাতে যথারীতি ছড়ি নিয়ে নিচে নামলেন। সিঁড়ি ড্রইংরুমের ভেতর নেমে এসেছে। নেমে দেখলেন, সোফায় কম্বল মুড়ি দিয়ে প্রভাতরঞ্জন ঘুমোচ্ছেন। দীনগোপালের ঠোঁটের কোণায় একটু হাসি ফুটে উঠল। নবর বল্লমটা সাবধানে তুলে নিলেন এবং নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। তারপর দরজা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিলেন।

বল্লমটা লনের মাটিতে পুঁতে রেখে গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন দীনগোপাল। গেট রাতে তালাবন্ধ থাকে। একটা চাবি তাঁর কাছে, অন্যটা নবর কাছে। নব উঠতে রোজই দেরি করে।

দীনগোপাল রাস্তায় নেমে একটু দাঁড়ালেন। রাস্তাটা পূর্বপশ্চিমে লম্বা। পশ্চিমে এক কিলোমিটার-টাক গেলে টিলা পাহাড়গুলো। পূর্বে আধ কিলোমিটার হাঁটলে ক্যানেলের স্লুইস গেট। তার দক্ষিণে এই রাস্তার বাঁকে বাজার এলাকা। তারপর রেল স্টেশন।

পশ্চিমে টিলাগুলোর দিকেই হাঁটতে থাকলেন দীনগোপাল। প্রথম টিলাটার মাথায় এখনও চড়তে পারেন। কাল বিকেলে নীতা

তাঁকে কিছুতেই চড়তে দিল না। সেজন্যই যেন জেদ চেপেছিল মাথায়। টিলাটার শীর্ষে একটা খর্বুটে পিপুল গাছ আছে। নিচে একটা বেদীর মতো কালো পাথর আছে। পাথরটাতে বসে সূর্যোদয় দেখবেন ভাবতে ভাবতে মনে হলো, পাথরটা এখনও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

তা হোক। এই উনআশি বছরের জীবনে অনেক ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডার ঘা খেয়েছেন দীনগোপাল।...

দোতলার পুবের ঘরে দীনগোপাল, মাঝখানেরটাতে নীতা, পশ্চিমের ঘরে শান্ত। শান্তর ঘরেই প্রভাতরঞ্জনের শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। চারটেয় যখন শান্ত শুতে আসে, নীতা তখনও জেগে ছিল। শান্ত ঘরের দরজা বন্ধ করছে, তাও শুনেছিল। তারপর কখন তার ঘুম এসে যায়।

দীনগোপাল বেরিয়ে যাওয়ার মিনিট দশেক পরে নীতার ঘুম ভেঙে গেল। নিচে প্রভাতরঞ্জনের উত্তেজিত ডাকাডাকি শুনতে পেল। সে উত্তরের জানালা খুলে উঁকি দিল। বাইরে কুয়াশা। কিছু দেখা যাচ্ছে না।

নীতা দ্রুত ঘুরে এসে দরজা খুলে বেরুল। নিচে নেমে দেখল, পুবের ঘর থেকে চোখ মুছতে মুছতে দীপ্তেন্দু সবে বেরুচ্ছে। তারপর পশ্চিমের ঘর থেকে ঝুমা বেরিয়ে এল, গায়ে আলখাল্লার মতো লালচে গাউন। প্রভাতরঞ্জন ব্যস্তভাবে বললেন বল্লম! বল্লম অদৃশ্য!

নীতার চোখ গেল বাইরের দরজার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দম আটকানো গলায় বলল— দরজা খোলা!

প্রভাতরঞ্জন সশব্দে ভেজানো দরজা খুলে বারান্দায় গেলেন। তারপর তাঁকে ঝাঁপ দেবার ভঙ্গিতে নিচের লনে নামতে দেখা গেল এবং ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন—সর্বনাশ! সর্বনাশ!

দীপ্তেন্দু দৌড়ে গেল। নীতা ও ঝুমা বারান্দায় গিয়ে দেখল, নিচে শিশির ভেজা ঘাসে বল্লমটা বেঁধা এবং প্রভাতরঞ্জন সেটার এদিক থেকে ওদিকে মাকুর মতো আনাগোনা করছেন। দীপ্তেন্দু বল্লমটা উপড়ে তুলল। তখন প্রভাতরঞ্জন হাঁসফাঁস করে বললেন—রক্তটক্ত লেগে নেই তো?

দীপ্তেন্দু ভাল করে দেখে বলল—নাঃ! কিন্তু ব্যাপারটা কী? প্রভাতরঞ্জন সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন—নীতু! শীগগির ওপরে গিয়ে দ্যাখ তো দীনুদা ঘুমুচ্ছেন নাকি! তাঁর গলার স্বর ছ্যাৎরানো—কিছুটা হিমও এর কারণ। দেখে মনে হচ্ছিল, কাঁপছেন। সেটা অবশ্যি হিমের চেয়ে উত্তেজনার দরুনই। এই সময় নব বারান্দার লাগোয়া কিচেন-কাম ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। নীতার উদ্দেশ্যে বলল—বাবুমশাই বেড়াতে বেরুলেন দিদি! আজ আমি ওঁর আগেই উঠেছি। সে খি খি করে হাসল। —দেখি কী, বাবুমশাই বল্লমখানা পুঁতে দিয়ে চলে গেলেন। আমার বল্লমখানা বরাবর ওঁর অপছন্দ।

নীতা কোনও কথা না বলে ওপরে চলে গেল। তারপর দীনগোপালের ঘরের দরজায় তালা দেখে আশ্বস্ত হলো। সে শান্তর ঘরের দরজায় গিয়ে ডাকতে লাগল—শান্তদা! উঠে পড়ো—দারুণ মজার ঘটনা ঘটেছে। নীতার হাসি পেয়েছিল জ্যাঠামশাইয়ের কৌতুকবোধ দেখে। গম্ভীর ধাতের মানুষ। এমন রসিকতা কল্পনা করা যায় না···

নিচে দীপ্তেন্দু ও প্রভাতরঞ্জন তখন নবকে ধমক দিচ্ছেন পালাক্রমে। কেন সে সঙ্গে সঙ্গে জানায়নি? ঝুমা ঘরে ঢুকে অরুণকে ওঠানোর চেষ্টা করছিল। খিমচি এবং শেষে গালে বাসি দাঁতের একটা প্রেম-কামড় খেয়েই অরুণ চোখ মেলল। ঝুমা মুখে মিথ্যা আতঙ্কের ভাব ফুটিয়ে বলল—বাইরে কী হচ্ছে দ্যাখো গিয়ে! বল্লমটা কে বিঁধিয়ে দিয়ে গেছে—

সর্বনাশ! বলে সে স্ত্রীর কথা শেষ হবার আগেই কম্বল থেকে বেরিয়ে পড়ল। তারপর একলাফে ড্রইংরুম পেরিয়ে বাইরের বারান্দায় গেল। চিড় খাওয়া গলায় চেঁচাল—হোয়াট হ্যাপনড্? মার্ডার? ও মাই গড! সে জ্যাঠামশাইয়ের রক্তাক্ত লাশ দেখতে যাচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে লনে ঝাঁপ দিল।···

এতক্ষণে দীনগোপাল প্রায় সিকি কিলোমিটার দূরে। সরডিহি

এলাকায় প্রকৃত শীত আসতে এখনও কয়েকটা দিন দেরি। শেষ হেমন্তের ভোরবেলায় এই শীতটা বাইরের লোককে পেলে হয়তো মেরেই ফেলবে। কিন্তু দীনগোপালের এ মাটিতে প্রায় অর্ধশতক কেটে গেল।

ইচ্ছে করেই একটু জোরে হাঁটছিলেন তিনি। বুঝতে পারছিলেন, তাঁর ঘর তালাবন্ধ দেখে ওরা তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়বে। ব্যাপারটা প্রচণ্ড বিরক্তিকর ঠেকেছে দীনগোপালের। তাঁর কোনও শত্রু নেই বলেই জানেন—অন্তত তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলবে, এমন কেউ নেই। কারণ জীবনে কারুর সঙ্গে এতটুকু ঝগড়া—বিবাদ করেননি। বরাবর সমস্ত কিছুতে নির্লিপ্ত এবং একানড়ে স্বভাবের মানুষ তিনি। স্থানীয় কোনও ঘটনা বা দুর্ঘটনার সঙ্গে কোনোদিন জড়িয়ে পড়েননি। সরডিহির সবাই তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। তাঁর মতো মানুষের কী বিপদ ঘটতে পারে, কিছুতেই মাথায় আসছে না।

বিপদ ঘটার অন্য একটা সম্ভাবনার দিক অবশ্যি ছিল। তা হলো, ধনসম্পত্তি। কিন্তু সেও যতটুকু আছে, সবটাই ব্যাঙ্ক আর সরকারী-বেসরকারী কিছু কাগজে, অর্থাৎ ঋণপত্রে। সুদের টাকার সামান্য কিছু অংশ জীবনযাত্রার জন্য নেন। বাকিটা জমার ঘরে ঢুকে যায়। বছর বিশেক আগে দশ কিলোমিটার দূরে খনি অঞ্চলে গোটা তিনেক খনির মালিক ছিলেন। সেগুলো সরকার নিয়ে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন, সেই টাকা। একসময় ক্যানেল এলাকায় কিছু জমি কিনেছিলেন। কিন্তু চাষবাসের ঝুটঝামেলা বড্ড বেশি। জমিগুলো বেচে দিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে মাত্র লাখ দেড়েক টাকা লগ্নি করা আছে। তাঁর মৃত্যুর পর ভাইপো ভাইঝিরা তা পাবে। মাঝে মাঝে অবশ্যি এ নিয়েও চিন্তাভাবনা করেছেন। অরুণ, দীপ্তেন্দু—ওদের পয়সাকড়ির অভাব নেই। অরুণ তাঁর পরের ভাই সত্যগোপালের ছেলে। সত্যগোপাল কলকাতায় বিশাল কারবার ফেঁদেছিলেন। মৃত্যুর পর সে-সবের মালিক হয়েছে অরুণ। একটু খ্যাপাটে স্বভাবের হলেও টাকাকড়ির ব্যাপারে হুঁশিয়ার। পরের ভাই নিত্যগোপালের নাম ছিল ডাক্তার

হিসেবে সুখ্যাত। নিত্যগোপালের মৃত্যুর পর দীপ্তেন্দু যদিও মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভের চাকরি নিয়েছে, সেটা ওর নেহাত খেয়াল। ডাক্তারি পড়ানো যায়নি ওকে, পালিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। বছর খানেক প্রায় নিরুদ্দেশ। বাবার মৃত্যুর পর বাড়ি ফেরে। তাহলেও ওর বাবা যা রেখে গেছেন, তা ওর পক্ষে যথেষ্ট। শুধু শান্তর বাবা প্রিয়গোপাল কিছু রেখে যাননি। মাথায় সন্ন্যাসের ঝোঁক চেপেছিল। এখন নাকি হরিদ্বারের কোন আশ্রমে আছেন—একেবারে সাধুবাবা! শান্তর মা সুইসাইড করেছিলেন. সেটাই প্রিয়গোপালের সংসারত্যাগের কারণ কি না কে জানে! শান্ত ভাগ্যিস ততদিনে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছিল। মফস্বলের স্কুলে মাস্টারি পেয়ে যায়। তারপর উপগ্রন্থী রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়ে। এখন সে কলকাতায় কী করে-টরে, দীনগোপাল জানেন না।

আর নীতা ছোটভাই জয়গোপালের মেয়ে। জয়গোপাল এবং তাঁর স্ত্রী নন্দিনী বছর দুই আগে ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা যান। তার আগে অবশ্যি নীতার বিয়ে হয়েছিল। গত বছর স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে নীতার। লোকটা নাকি লম্পট আর মাতাল। তবে বিয়ের পর নীতা তার স্বামী প্রসূনকে সঙ্গে নিয়ে দীনগোপাল কাছে এসেছিল, হনিমুনে আসার মতোই, তখন দীনগোপালের মনে সন্দেহ জেগেছিল ওদের দাম্পত্য-সম্পর্কে কোথায় যেন কিসের একটা অভাব আছে। তার চেয়ে বড় কথা, প্রসূনকে পছন্দ হয়নি দীনগোপালের। আর নবও চুপিচুপি বলেছিল, জামাইবাবু লোকটা সুবিধের নয়, বাবুমশাই! মহুয়ার মদ কোথায় পাওয়া যায় জিগ্যেস করছিলেন।

নীতা একটা আফিসে স্টেনো-টাইপিস্টের চাকরি করে। তাকেও বারবার ডেকেছেন দীনগোপাল, আমার কাছে এসে থাক্। কী দরকার চাকরি করার? নীতার এক কথা, কলকাতা ছেড়ে থাকতে পারবে না। তবে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতে তার আপত্তি নেই।

দীনগোপালের গোপন পক্ষপাতিত্ব নীতার প্রতিই। তার জন্য তাঁর বেশি মমতা। তাই ভাবেন, বরং উইল করে নিজের যা কিছু

আছে, নীতার নামেই দেবেন। কিছুদিন আগে ফিরোজাবাদে তাঁর অ্যাটর্নির সঙ্গে এ নিয়ে শলাপরামর্শ করেও এসেছেন। তারপর হঠাৎ নীতা চলে এল। গতকালও ভাবছিলেন, ফিরোজাবাদে গিয়ে কাজটা সেরে ফেলবেন। নীতাকে দেখে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। কী উজ্জ্বল দীপ্তি ছিল চেহারায়, ক্ষয়ে গেছে একেবারে। দীনগোপাল ভাবতে ভাবতে হাঁটছিলেন। একটু পরে তাঁর ভাবনা মোড় নিল। অবাক হয়ে গেলেন। গতকাল সন্ধ্যায় একের পর এক করে দীপ্তেন্দু, অরুণ, প্রভাতরঞ্জন এবং শেষে শান্ত এসে হাজির। কৈফিয়তটা বড্ড হাস্যকর আর রহস্যময়। এর মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছেন না। বাসস্টপে-বাসস্টপে ঘুরে একটা দাড়িওয়ালা কালো চশমাপরা লোক কেনই বা ওদের অমন একটা উদ্ভট কথা বলে সরডিহি পাঠিয়ে দেবে, বিপদটাই বা কী, নাকি সবাই মিলে ওঁর সঙ্গে তামাশা করতে এসেছে, কিছু বোঝা যায় না।

তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন দীনগোপাল। ভুঁরু কুঁচকে গেল। ঠোঁটের কোণায় বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। সমস্ত ব্যাপারের পেছনে একটা ক্রূর অভিসন্ধি ওত পেতে আছে যেন। বাসস্টপের লোকটা…

অথবা সবটাই ওই প্রভাতরঞ্জনের কারসাজি। ওঁকে বোঝা কঠিন। রাজনীতিওয়ালারা দীনগোপালের চক্ষুশূল। তবে এমনিতে প্রভাতরঞ্জন বেশ মনখোলা মানুষ। তাছাড়া নীতার বাবার সঙ্গে নিজের বোনের বিয়ের ঘটকালি তিনিই করেছিলেন—এর সঙ্গে দীনগোপালের সঙ্গে তাঁর পূর্ব পরিচয় এবং বন্ধুতার সূত্র ছিল। রাজনীতি করার সময় ফেরারি আসামী প্রভাতরঞ্জন কতবার দীনগোপালের বাড়িতে এসে লুকিয়ে থেকেছেন। খনি এলাকায় ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ছিলেন তখন। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থেকে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ চালাতেন। কিন্তু যখনই দীনগোপাল বুঝতে পারতেন, তাঁর বাড়িটি "রাজনীতির ঘাঁটি হয়ে উঠেছে, তখনই সোজা প্রভাতরঞ্জনকে বলতেন—আর নয় হে! এবার তল্পি গোটও। প্রভাতরঞ্জনের এই একটা গুণ, তাঁর ওপরে রাগ করতেন না। একটু বেহায়া ধাতের

মানুষ বটে। ফের কোনও এক রাতে এসে হাসিমুখে হাজির হতেন।

কিছু বোঝা যাচ্ছে না। দীনগোপাল উদ্বিগ্ন হয়ে হাঁটছিলেন। টিলাগুলোর কাছাকাছি রাস্তার চড়াই শুরু। এবার একটু ক্লান্তি এল। বাঁদিকে ঝোপজঙ্গল আর ন্যাড়া পাথুরে মাটি ঘিরে টিলার দিক থেকে একটা ঝিরঝিরে জলের ধারা এসে ছোট্ট সাঁকোর তলা দিয়ে চলে গেছে। সাঁকোর ধারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন।

ততক্ষণে কুয়াশা কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে। পেছনে পুবের আকাশে লালচে ছটা। সূর্য উঠেছে, তবে সরডিহির আড়ালে রয়েছে এখনও। বাঁদিকে ঝর্ণাধারার গা ঘেঁষে সামান্য দূরে সেই টিলাটা আবছা দেখা যাচ্ছে। মাথার পিপুল গাছটায় লাল রঙের ছোপ পড়েছে। কাছিমের খোলার গড়ন টিলাটার দিকে তাকাতে গিয়ে চোখের কোণা দিয়ে আবার লক্ষ্য করলেন, কিছুদিন ধরে যা ঘটছে, একটা আবছা মানুষমূর্তি!

কেউ ঝোপগুলোর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে নিশ্চল দাঁড়িয়ে দেখছে যেন।

ঘুরে সোজাসুজি তাকাতেই আর তাকে দেখতে পেলেন না দীনগোপাল। অভ্যাসমতো 'কে ওখানে' বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিলেন, কিন্তু কথাটি উচ্চারণ করলেন না। সোজাসুজি তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই টিলাটাও নজরে পড়েছিল। একটা লোক পিপুল গাছের নিচে এইমাত্র উঠে দাঁড়াল।

মুহূর্তে ক্ষিপ্ত দীনগোপাল ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে হন্তদন্ত এগিয়ে গেলেন। খোলা পাথুরে জমিটার ওপর দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ মনে হলো, চোখের কোণা দিয়ে অন্যদিনের মতো যে-ছায়ামূর্তি দেখেন, সে কোন মন্ত্রবলে একেবারে টিলার মাথায় চলে গেল—কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে?

টিলার শীর্ষে কুয়াশা হাল্কা হয়ে গেছে এবং ঈষৎ রোদ্দুরও পড়েছে। লোকটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাঁ চোখে ছানি, কিন্তু ডান চোখটা অক্ষত। দীনগোপালের দৃষ্টিশক্তি বরাবর প্রখর। একটা চোখে

পরিষ্কার দূরের জিনিস দেখতে পান। চশমার দরকার হয়নি এখনও। পিপুল গাছের তলায় দাঁড়ানো লোকটির পরনে ওভারকোট, মাথায় টুপি, একটা হাতে ছড়ি বলেই মনে হচ্ছে। মুখে একরাশ সাদা দাড়ি। অন্য হাতে কী একটা যন্ত্র ধরে চোখে রেখেছে এবং দূরে পূবদিকে কিছু দেখছে। দূরবীন বা বাইনোকুলার মনে হলো।

দীনগোপাল টিলা বেয়ে উঠতে শুরু করলেন। এই সময় চোখ থেকে যন্ত্রটি নামিয়া লোকটি দীনগোপালের দিকে ঘুরে তাকাল। দীনগোপাল নিচে থেকে রুষ্টভাবে চেঁচিয়ে বললেন—ও মশাই! শুনছেন? কে আপনি? ওখানে কী করছেন?

জবাব না পেয়ে আরও রুষ্ট দীনগোপাল ঢালু টিলা বেয়ে উঠে গেলেন। তারপর থমকে দাঁড়ালেন। সাদা দাড়িওলা লোকটির চেহারায় মার্জিত এবং অমায়িকভাব। রীতিমতো সাহেবসুবো মনে হলো। উজ্জ্বল ফর্সা রঙ। সরডিহি গির্জার পাদ্রি সলোমন সায়েবের প্রতিমূর্তি!

—নমস্কার! আশা করি, আপনিই দীনগোপালবাবু?

বিস্মিত দীনগোপাল কপালে হাত ঠেকালেন. নিছক ভদ্রতাবশে তাঁর মনে পড়েছিল একটা দাড়িওয়ালা লোক দীপ্তেন্দুদের সরডিহি আসতে প্ররোচিত করেছে এবং তার মতলব বোঝা যাচ্ছে না। এই লোকটিই সেই লোক কি? অবশ্য তার দাড়ির রঙ সাদা না কালো ওরা বলেনি। কিন্তু কথাটা হলো, এঁকে দেখে তো অত্যন্ত সজ্জন ভদ্রলোক মনে হচ্ছে। কণ্ঠস্বরও অমায়িক। শুধু হাতের ওই দুটো জিনিস সন্দেহজনক। বাইনোকুলারটা, এবং একটা ছড়ি—ঠিক ছড়ি নয়, ডগার দিকে জালের গোছা জড়ানো! জিনিসটা কী?

দীনগোপাল একটু দ্বিধায় পড়ে বললেন-- মশাইকে তো আগে কখনও দেখিনি! আপনি কে?

আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

—আপনি কর্নেল? দীনগোপাল একটু অবাক হয়ে বললেন। মানে মিলিটারির লোক?

—ছিলাম। বহু বছর আগে রিটায়ার করেছি।

—অ। তা আপনি এখানে···

—আপনার মতোই মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছি।

—আপনি আমার নাম বললেন! অথচ আপনার সঙ্গে আমার কস্মিনকালে চেনাজানা নেই!

—আপনার কথা আমি শুনেছি। কাল বিকেলে আপনাকে দূর থেকে বাইনোকুলারে দেখেছিও।

দীনগোপাল সন্দিগ্ধভাবে বললেন—আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। আপনি থাকেন কোথায়?

—কলকাতায়। গতকাল আমি সরডিহিতে বেড়াতে এসেছি। উঠেছি ইরিগেশান বাংলোয়।

দীনগোপাল ফের ওঁর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন—হুঁ, বুঝলাম। কিন্তু আমার কথা কে আপনাকে বলল? বলার কোনও স্পেসিফিক কারণই বা কী?

—সরডিহিতে বাঙালিদের মধ্যে আপনার যথেষ্ট সুনাম আছে। আর আমার স্বভাব, যেখানে যাই, সেখানকার মানুষজন সম্পর্কে খোঁজ খবর নিই।

দীনগোপাল এবার হাল্কা মনে একটু হাসলেন। —ভাল। খুব ভাল। তা ওই যন্ত্রটা দিয়ে কী দেখছিলেন?

—পাখি। বার্ড-ওয়াচিং আমার হবি।

—হুঁ। আর ওটা কি যন্তর?

—এটা প্রজাপতি ধরা জাল। বিশেষ কোনও স্পেসির প্রজাপতি দেখলে ধরার চেষ্টা করি!

দীনগোপাল হাসতে লাগলেন। কলকাতার লোকেদের মাথায় সব অদ্ভুত বাতিক থাকে দেখছি। তবে আপনার বাতিক বড্ড বেশি উদ্ভুটে, কর্নেল সায়েব!

—আচ্ছা দীনগোপালবাবু, আপনি সরডিহিতে এ বয়সে একা পড়ে আছেন কেন?

দীনগোপালের হাসি মুছে গেল। আস্তে বললেন—হঠাৎ এ

প্রশ্নের অর্থ?

—নিছক কৌতূহল, দীনগোপালবাবু!

দীনগোপাল চটে গেলেন আরও। —অদ্ভুত কৌতূহল! চেনা নেই, জানা নেই, হঠাৎ কোত্থেকে এসে এই উটকো প্রশ্ন। আপনার কি অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর স্বভাব, নাকি আপনি—

—বলুন, দীনগোপালবাবু!

দীনগোপাল ক্রুদ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন—কে আপনি? কেন এমন আজগুবি প্রশ্ন করছেন?

—প্লিজ, আমাকে ভুল বুঝবেন না! আমি আপনার হিতৈষী।

—কোনও উটকো লোকের এই উদ্ভট প্রশ্নের জবাব দিতে আমি রাজী নই—তা আপনি মিলিটারির কোনও কর্নেল হোন, আর যেই হোন। বলে দীনগোপাল সটান ঘুরে টিলা বেয়ে নামতে থাকলেন। আপন মনে গজগজ করছিলেন—কেন এখানে একা পড়ে আছি! যাবটা কোথায়? সরডিহি আমার ভাল লাগে। একলা থাকতে ভাল লাগে। অদ্ভুত কথা তো! তারপর হঠাৎ থেমে ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে বিকৃত কণ্ঠস্বরে বললেন—জাল নোটের কারখানা খুলেছি, বুঝলেন? চোরাচালানের কারবার করছি। আরও শুনবেন? মেয়ে পাচারের ঘাঁটি গড়েছি। নার্কোটিক্স চালানও দিই। ডাকাতের দল পুষি।...

একটু পরে রাস্তায় পৌঁছে আবার ঘুরে টিলার মাথায় কর্নেলকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টে দেখে নিলেন। কর্নেলের চোখে বাইনোকুলার। তারপর দ্রুত টিলার অন্যদিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দীনগোপালের শরীর অবশ। মনে হলো, আর এক পাও হাঁটতে পারবেন না।

কিছুক্ষণ পরে উত্তেজনা কেটে গেল। ঠোঁটের কোণায় বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। বহু বছর আগে এক সন্ন্যাসী তাঁকে ঠিক এই প্রশ্নটাই করেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে এমন আকস্মিকতা ছিল না। ছিল না এমন একটা রহস্যময় পরিপ্রেক্ষিতও। সন্ন্যাসী বলেছিলেন, একলা পড়ে আছ বেটা! এই একলা থাকাটাকে কাজে লাগাও। জেনো

একলা থাকা মানুষই যোগী হতে পারে। আর যোগী কে—না, যে যোগ করে। যোগ কিসের সঙ্গে? মনের সঙ্গে আত্মার যোগ। এই যোগ সময়কে থামিয়ে দেয়। সময় বলে কোনও জিনিস তখন থাকে না। অথচ আত্মা থাকে। আনন্দের মধ্যে লীন হয়ে থাকে।

সাধুসন্ন্যাসীদের সবই হেঁয়ালি। সেটা একটা দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাপার। কিন্তু ওই ভদ্রলোক—কর্নেল! তাঁর হঠাৎ এই হেঁয়ালির মানেটা কি? কেন এ প্রশ্ন—অতর্কিতে? ··

শান্তকে বাইরে থেকে ডাকাডাকি করে এবং বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়েও জাগাতে পারেনি নীতা। কোনও সাড়াও পায়নি। বিরক্ত হয়ে নিচে নেমে এসেছিল। শান্ত এমন মড়ার মতো ঘুমোয়, সে জানত না।

লনে অরুণকে নিয়ে তখন খুব হাসাহাসি হচ্ছে অরুণ 'মার্ডার' বলে ঝাঁপ দিতে গিয়ে সিঁড়িতে আছাড় খাওয়ার উপক্রম, সেটাই সবচেয়ে হাসির ব্যাপার। নীতাকে দেখে প্রভাতরঞ্জন হাঁকলেন—দীনুদা? অর্থাৎ নবর কথা সত্যি কি না। নীতার মুখে দীনগোপালের ঘরের দরজা বাইরে থেকে তালা আটকানো শুনে তিনি গুম হয়ে বললেন—দীনুদাটা চিরকাল এরকম একগুঁয়ে মানুষ। কোনও মানে হয়? ওর সেফটির জন্য আমরা সারারাত জেগে পাহারা দিলাম, আর দিব্যি একা বেড়াতে বেরুল? এভাবে রিস্ক নেবার কোনও মানে হয়?

অরুণ ব্যস্ত হয়ে বলল—মামাবাবু, চলুন, আমরা জ্যাঠামশাইকে গিয়ে দেখি—কোনও বিপদ ঘটল নাকি! দীপু তুইও আয়।

দীপ্তেন্দু বলল—হ্যাঁ। আমাদের যাওয়া উচিত। এতক্ষণ নিশ্চয় বেশি দূরে যেতে পারেননি।

ওরা তিনজনে শশব্যস্তে পা বাড়ালে পেছন থেকে ঝুমা বলল—আহা, সশস্ত্র হয়ে যাও। বল্লমটা অন্তত হাতে নাও!

সে মুখ টিপে হাসছিল। নীতাও হেসে ফেলল। কারণ বউয়ের কথায় সত্যিই অরুণ বল্লমটা দীপ্তেন্দুর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল।

গেট খুলে দিল নব। দীনগোপাল বেরুনোর সময় বাইরে থেকে গরাদ দেওয়া গেটে তালা আটকে দিয়েছিলেন।

নব ফিরে এসে বলল—আপনাদের জন্য চা করে দিই ততক্ষণ। ওঁরা ফিরে এলে তখন ফের করে দেব।

ঝুমা বলল—আমার কিন্তু র। দুধ দেবে না।

নব কিচেনে গিয়ে ঢুকলে নীতা লনে নামল। ডাকল—এসো বউদি, মর্নিং ওয়াক করি ততক্ষণ।

ঝুমা বলল—বড্ড কুয়াশা। ঠাণ্ডা লেগে যাবে। রোদ্দুর উঠতে দাও না।

নীতা বলল—আমার ঠাণ্ডা লাগবে না। গত দুদিনই জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছি। কতদূরে জানো? সেই টিলাগুলো অব্দি। এসো না বউদি, গেটে গিয়ে দেখি মামাবাবুরা কোনদিকে গেলেন!

ঝুমা অনিচ্ছা অনিচ্ছা করে লনে নামল। তারপর নীতার পাশে গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল-জ্যাঠামশাই যেদিকে গেছেন, দেখবে ওরা ঠিক তার উল্টোদিকে গেছে।

নীতা হাসল।—শান্তদাকে ডেকে ওঠাতে পারলাম না। ও দলে থাকলে সুবিধে হতো। দুজন করে দুদিকে খুঁজতে যেত। জ্যাঠামশাই কোনও কোনও দিন উল্টোদিকে ক্যানেলের স্লুইসগেটের কাছেও যান।

—শান্ত উঠল না?

—নাঃ। একেবারে কুম্ভকর্ণ।

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে নীতা নিচের রাস্তায় দুদিকে দলটাকে খুঁজছিল। কুয়াশায় কিছু দেখা যাচ্ছিল না। সে চাদরটা এতক্ষণে মাথায় ঘোমটার মতো টেনে দিলে ঝুমা আস্তে বলল—শান্তার বিয়ের কথা বিশ্বাস হয় তোমার?

নীতা বলল-ও জ্যাঠামশাইয়ের মতো আনপেডিক্টেবল। শুনলে তো, রাত্তিরে জ্যাঠামশাইয়ের সামনেই জোর দিয়ে বলল, বিয়ে করেছে।

—কিন্তু বউকে সঙ্গে আনল না কেন ?

—হয়তো এমন একটা সিচুয়েশানে সঙ্গে আনা ঠিক মনে করেনি। ঝুমা একটু পরে বলল—আমার বিশ্বাস হয় না।

—কেন ?

ঝুমা একটু গম্ভীর মুখে বলল—বিবাহিত পুরুষ চেনা যায়। অনন্ত আমি চিনতে পারি।

নীতা হাসতে হাসতে বলল—কোনও বিশেষ লক্ষণ দেখে বুঝি ? কী লক্ষণ ? শারীরিক না মানসিক !

—দুই-ই।

নীতা দুই কাঁধে এবং হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে একটা ভঙ্গি করে বলল-কে জানে বাবা ! আমি ওসব বুঝিটুঝি না।

নব ডাকছিল।···দিদি বউদিদি ! চা রেডি।

ঝুমা বলল—এখানে দিয়ে যাও !

নীতা বলল—ঠাণ্ডার ভয়ে বেরুচ্ছিলে না বউদি। এখন কেমন এনজয় করছ দেখ।

নব চা নিয়ে এল। নীতা বলল—নবদা ! তুমি গিয়ে দেখো তো, শান্তদাকে ওঠাতে পারো নাকি।

ঝুমা আস্তে বলল—ওকে বলবে একটা সংঘাতিক কাণ্ড হয়েছে। ব্যাস্। দেখবে হইহই করে বেরিয়ে পড়বে।

নব গম্ভীর মুখে চলে গেল। নীতা চায়ে চুমুক দিয়ে বলল—এবার এসে এবং জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে আমার মধ্যে একটা দারুণ চেঞ্জ ঘটেছে, জানো বউদি ?

কী চেঞ্জ ?

—সরডিহিতে থেকে যেতে ইচ্ছে করছে। বেশ নিরিবিলি সুন্দর ন্যাচারাল স্পট। কলকাতায় থাকলে রাজ্যের উটকো প্রব্লেম এসে ব্রেনকে ঘুলিয়ে তোলে। নীতা শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে বলতে লাগল। —এখানে এসে সেগুলো একেবারে অর্থহীন লাগছে। আসলে আর্বান লাইফে সব সময় কতকগুলো কৃত্রিম সমস্যা মানুষকে ব্যস্ত করে

রাখে। এখানে কিন্তু কোনো সমস্যাই নেই।

—আছে। হঠাৎ করে দুদিন এসে থেকে-টেকে সেটা বোঝা যায় না।

—উঁহু। তুমি জ্যাঠামশাইয়ের কথা ভাবো বউদি। দিব্যি আছেন।—

—কোথায় আছেন? ঝুমা অন্যমনস্কভাবে বলল। —কী জন্য তাহলে তোমরা ছুটে এসেছ, ভেবে দেখো। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। সরডিহি, আফটার অল অন্য প্ল্যানেট তো নয়।

নীতা একটু চুপ করে থাকার পর বলল—এটা একটা আনইউজুয়্যাল ব্যাপার। হয়তো সত্যি কেউ জোক করেছে কোনও উদ্দেশ্যে। তবে যাই বলো, আমি সরডিহির প্রেমে পড়ে গেছি।

ঝুমা বাঁকা হেসে বলল—তুমি তো চিরপ্রেমিকা। হুট করতেই প্রেমে পড়ো এবং সাফার করো।

নীতা একটু চটে গেল খোঁচা খেয়ে। কিন্তু কিছু বলল না। গম্ভীর হয়ে দূরে তাকিয়ে রইল।

—এই তো! রাগ করলে! এজন্যই নাকি মুনি-ঋষিরা বলেছেন অপ্রিয় সত্য কক্ষণো বলো না। ঝুমা তার কাছে গেল।—সরি, নীতা। অ্যাপলজি চাইছি।

নীতা অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেসে ফেলল ওর ভঙ্গি দেখে। তারপর বলল —কিন্তু নব যে শান্তদাকে ওঠাতে গেল! পাত্তা নেই কেন?...

দীনগোপাল থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন বল্লমধারী অরুণ এবং প্রভাতরঞ্জনকে দেখে। প্রভাতরঞ্জন ওঁর মুখের রাগী ভাব দেখে আমতা-আমতা করে বললেন—মানে, আমরা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম দীনুদা!

দীনগোপাল রূঢ় স্বরে বললেন—তোমাদের এ পাগলামি সত্যি বরদাস্ত হচ্ছে না।

অরুণ বলল—কিন্তু জ্যাঠামশাই, যাই বলুন, এভাবে আর আপনার একা বেরুনো উচিত হয়নি।

—উচিত অনুচিতের ব্যাপাটা আমি বুঝব। দীনগোপাল পা বাড়িয়ে বললেন—তোমাদের মতলব আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না।

মাই গড! অরুণ হতভম্ব হয়ে বলল। —এ আপনি কি বলছেন জ্যাঠামশাই? আমরা এতগুলো লোক সব্বাই আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছি? কী আশ্চর্য! বাসস্টপে সত্যি একটা লোক—সে অভিমানে চুপ করল।

দীনগোপাল জবাব দিলেন না। প্রভাতরঞ্জন বললেন দীনুদা, তুমি কিন্তু আমাকেই আসলে অপমান করছ। আমাকেও তুমি মিথ্যা বাদী বলছ, মাইগু দ্যাট।

দীনগোপাল তবু চুপচাপ হাঁটতে থাকলেন।

প্রভাতরঞ্জন ক্ষুব্ধভাবে বললেন—তোমার সেফটির জন্য আমরা এত কাণ্ড করছি কাল থেকে। আর তুমি এর মধ্যে মতলব দেখছ। কী মতলব? তোমার ভাইপো-ভাইঝিদের মতলব থাকার কথা—অবশ্যি, আছে তা বলছি না—জাস্ট্ একটা সম্ভাবনা। কারণ তোমার কিছু প্রপার্টি হয়তো আছে—কী বা কতটা আছে, তাও আমি জানি না। কিন্তু আমি? আমার কী মতলব থাকতে পারে? তুমি একসময়ে আমাকে দুর্দিনে আশ্রয় দিয়েছে-সাংঘাতিক রিস্ক্ নিয়েছ। আমি তোমার কাছে ঋণী। তাছাড় বরাবর আমি তোমার হিতৈষী।

—হঠাৎ ভুঁইফোড় হিতৈষীদের জ্বালায় আমি অস্থির। দীনগোপাল বাঁকা হাসলেন।—একটু আগে একটা অদ্ভুত লোকের সঙ্গে দেখা হলো। সেও হঠাৎ বলে কিনা—আমি আপনার হিতৈষী।

প্রভাতরঞ্জন ও অরুণ দুজনেই চমকে উঠেছিল। একগলায় বলল লোক!

—হ্যাঁ। তারও মুখে দাড়ি আছে।

ফের দুজনে একগলায় বলে উঠল—দাড়ি!

—হ্যাঁ দাড়ি সাদা দাড়ি। দীনগোপাল আগের সুরে বললেন।—পাদ্রি সলোমন সায়েবের মতো পেল্লায় চেহারা! হাতে বাইনোকুলার আর প্রজাপতি-ধরা নেট। সরডিহিতে মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত

সব লোক আসে। তবে কেউ এ পর্যন্ত আমাকে বলেনি, আমি আপনার হিতৈষী।

প্রভাতরঞ্জন খুব ব্যাস্তভাবে বললেন··তাহলে তো ব্যাপারটা আরও গোলমেলে হয়ে পড়ল। লোকটার পরিচয় নিলে না কেন?

দীনগোপাল এবার একটু হাল্কা মেজাজে বললেন—বলল, মিলিটারির লোক ছিল। কর্নেল !...হুঁ, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। ইরিগেশান বাংলোয় উঠেছে বলল।

অরুণ বলল—খোঁজ নেওয়া দরকার। কিন্তু আগাগোড়া একটু ডিটেলস বলুন তো জ্যাঠামশাই!

দীনগোপাল বললেন – কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

অরুণ প্রভাতরঞ্জকে বলল—মনে হচ্ছে এ লোক বাসস্টপের লোকটা নয়, মামাবাবু! তাই না?

প্রভাতরঞ্জন বললেন--হ্যাঁ। আমাদের প্রত্যেকের বর্ণনা মিলে গেছে। দাড়ির কথা ধরছি না। নকল দাড়ি সাদা বা কালো দুই-ই হয়। কিন্তু গড়ন? দীনুদা বলল, পেল্লায় চেহারা—পাদ্রি সলোমনের মতো। এই পাদ্রি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে।

অরুণ বলল—আমিও তাঁকে দেখছি।

—হুঁ, অরুণ! চিন্তিত মুখে প্রভাতরঞ্জন বললেন। – তুমি এখনই ইরিগেশান বাংলোয় গিয়ে খোঁজ নাও, সেখানে সত্যি কোনও কর্নেল-টর্নেল এসেছেন কিনা। তারপর যা করার করব'খন। দীপুকে ওদিকে পাঠিয়েছি। দেখা হলে ওকে সঙ্গে নিও।

অরুণ তাঁর হাতে বল্লমটা গছিয়ে দিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল। দীনগোপাল বললেন—সঙ! জোকার একটা! সার্কাসের ক্লাউন!

প্রভাতরঞ্জন ব্যথিতস্বরে বললেন—আমাকে বলছ!

—না ওই অরুণটাকে। বলে দীনগোপাল ভুরু কুঁচকে একবার প্রভাতরঞ্জনকে দেখে নিলেন। একটু পরে গলা ঝেড়ে ফের বললেন· এভাবে বল্লম হাতে আমার সিকিউরিটি গার্ড সেজে পাশে পাশে

হেঁটো না। আমার খারাপ লাগছে। তুমি এগিয়ে যাও। আমি একটু পরে যাব।

দীনগোপাল রাস্তার ধারে পড়ে থাকা একটা প্রকাণ্ড পাথরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রভাতরঞ্জন বললেন—ওকে দীনুদা! সিকিউরিটি গার্ড তো সিকিউরিটি গার্ড। আমি তোমাকে একলা ফেলে রেখে যাচ্ছি না।

—খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, প্রভাত!

দীনগোপাল খাপ্পা মেজাজে কথাটা বললেন। কিন্তু গ্রাহ্য করলেন না প্রভাতরঞ্জন। বল্লমটা সঙ্গিনের মতো কাঁধে রেখে সকৌতুকে সান্ত্রীর স্যালুট ঠুকলেন। দীনগোপাল অমনি রাস্তা থেকে ঢালুতে নেমে হনহন করে উত্তরে টাঁড় জমিটার দিকে হেঁটে চললেন। জমিটার নিচের দিকে কিছু গাছপালা তারপর ক্যানেল। প্রভাতরঞ্জন একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর তাঁকে অনুসরণ করলেন। কিন্তু ক্যানেলের পাড়ে গিয়ে আর দীনগোপালকে দেখতে পেলেন না। পাড় বরাবর ঘন ঝোপঝাড়। প্রভাতরঞ্জন বারকতক 'দীনুদা' বলে ডাকাডাকি করার পর তেতো মুখে আপন মনে বললেন—বদ্ধ পাগল! জানে না কি বিপদ ঘটতে চলেছে।

তারপর তাঁকে খুঁজে বের করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। ততক্ষণে রোদ্দুর ফুটেছে এবং কুয়াশা হাল্কা হয়ে গেছে। কিন্তু ঝোপঝাড়ের ভেতর দীনগোপাল গুঁড়ি মেরে কোনদিকে নিপাত্তা হলেন, প্রভাতরঞ্জন বুঝতে পারছিলেন না। ক্যানেলটা পুব-পশ্চিমে লম্বা। প্রথমে পশ্চিমেই পা বাড়ালেন প্রভাতরঞ্জন। …

নীতা বলল—ধুস! নব শান্তদাকে ডাকতে গিয়ে নিপাত্তা হয়ে গেল যেন।

—আমি ভাবছি মামাবাবু আর তোমার শ্রীমান দাদাটির কথা। ঝুমা হাসতে হাসতে বলল। —জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে গেল, হাতে বল্লম! জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে এতক্ষণ যুদ্ধ বেধে গেছে!

নীতা আনমনে বলল—কেন ?

ঝুমা প্রশ্নে কান না দিয়ে বলল—লাঠি ভার্সেস বল্লম। বল্লমটা অবশ্য লাঠির ঘায়ে ধরাশায়ী—নীতা! দেখো, দেখো। যা বলছিলাম। তোমার শ্রীমান দাদা জগিং করছে, অথবা তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসছে। আরে! ওদিকে কোথায় যাচ্ছে ?

নীতা গেট থেকে দেখল অরুণ জগিংয়ের ভঙ্গিতে নিচের রাস্তা দিয়ে উধাও হয়ে গেল। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ডাকবে বলে ঠোঁট ফাঁক করেছিল, কিন্তু সুযোগ পেল না। অরুণ দ্রুত নাগালের বাইরে চলে গেল।

ঝুমা বলল—কিছু মনে কোর না নীতা! তোমাদের বংশে পাগলদের সংখ্যা বড্ড বেশি।

—ঠিকই বলেছ বউদি! নীতা হাসল। আই এগ্রি। ওই দেখো, উল্টোদিক থেকে দীপুদা এসে গেছে।

অরুণ এবং দীপেন্দুকে মুখোমুখি দুটি ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়ানো দেখা যাচ্ছিল। তারপর দুজনে কুয়াশার ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। ঝুমা ব্যাপারটা দেখার পর মন্তব্য করল—একটা ব্যাপার বোঝা গেল। জ্যাঠামশাইকে এখনও ওরা খুঁজে পায়নি।

তাকে এবার একটু গম্ভীর দেখাচ্ছিল। নীতা বলল—আমার ধারণা, জ্যাঠামশাই খুব বিরক্ত হয়েছেন।

—হবারই কথা! ঝুমা ওর হাত ধরে টানল। বড্ড ঠাণ্ডা লাগছে এখানে। চলো, ঘরে গিয়ে বসি।

লন পেরিয়ে দুজনে বাইরের বারান্দায় পৌঁছে ওপরতলায় নবর হাঁকাহাঁকি এবং দরজায় ধাক্কার শব্দ শুনতে পেল। ঝুমা বলল—কী আশ্চর্য! সেই তখন থেকে নব ওকে ওঠাতে পারছে না? কী কুম্ভকর্ণ রে বাবা!

সে দ্রুত ঘরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকল। পেছনে নীতা। ওপরে গিয়ে ওরা দেখল, নব এবার দরজায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো লাথি মারতে শুরু করেছে। ঝুমা দম আটকানো গলায় বলল—সাড়া পাচ্ছ না ?

সেই মুহূর্তে পুরনো দরজার একটা কপাট মড়াৎ করে ভেঙে গেল এবং নব আবার লাথি মারলে সেটা প্রচণ্ড শব্দে জং ধরা কব্জা থেকে উপড়ে ভেতরে পড়ল। ঘরের ভেতর আবছা অন্ধকার। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল নব। তারপরই সে চেঁচিয়ে উঠল— দাদাবাবু! সর্বনাশ!

দরজা থেকে নীতা ও ঝুমা উঁকি মেরে দেখেই আঁতকে পিছিয়ে এলো ঝুমা দুহাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল। নীতা দেয়াল আঁকড়ে ধরেছিল। ঠোঁট কামড়ে আত্মসম্বরণের চেষ্টা করছিল সে। ঘরের মাঝামাঝি কড়িকাঠ থেকে শান্ত ঝুলছে। গলায় একটা মাফলারের ফাঁস আটকানো। ঝুলন্ত পায়ের একটু তফাতে একটা চেয়ার উল্টে পড়ে আছে।

নীতা ভাঙা গলায় অতিকষ্টে ডাকল—নব!

নব বেরিয়ে এল। কিন্তু কোনও কথা বলল না। পাথরের মূর্তির মতো মাঝখানের অপ্রশস্ত করিডর থেকে নেমে যাওয়া সিঁড়ির মাথায় একটু দাঁড়াল। কিছু বলবে মনে হলো এবার। কিন্তু বলল না। সশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। ঝুমা তখনও দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপি য় কাঁদছে। নীতা দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

## ॥ তিন ॥

বাইনোকুলারে পাখির ঝাঁকটিকে দেখেই চঞ্চল হয়েছিলেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। লাল ঘুঘু পাখির ঝাঁক। ইদানিং এই প্রজাতির ঘুঘু দেশে বিরল হয়ে এসেছে। এরা পায়রাদের মতো ঝাঁক বেঁধে থাকে। ক্যামেরায় টেলিলেন্স এঁটে দূরত্বটা দেখে নিলেন। কিন্তু কুয়াশা এখনও রোদকে ঝাপসা করে রেখেছে। কাছাকাছি না গেলে ছবি তোলা অসম্ভব। তাই সাবধানে গুঁড়ি মেরে এগোতে থাকলেন।

কাছিমের পিঠের গড়ন একটা পাথুরে মাটির ডাঙা। খর্বুটে ঝোপঝাড়ে ডাঙা জমিটা ঢাকা। লাল ঘুঘুর ঝাঁক ঝোপগুলোর ডগায়

বসে সম্ভবত রোদের প্রতীক্ষা করছে।

প্রাকৃতিক ক্যামোফ্লেজ ব্যবস্থা সত্যিই অসামান্য। খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও আনাড়ি চোখে পাখিগুলোকে আবিষ্কার করা কঠিন। ঝোপের রঙের সঙ্গে ওদের ডানার রঙ একাকার হয়ে গেছে। এখানে-ওখানে ছোট-বড় পাথরের চাঙড়, ক্ষয়াটে চেহারার গাছ কিংবা ঝোপ—খুব সাবধানে সেগুলোর আড়ালে গুঁড়ি মেরে কর্নেল এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এবার একটা নিচু জমি। পাথরের ফাঁকে কাশঝোপ মাথা সাদা করে দাঁড়িয়ে আছে। কিসে পা জড়িয়ে গেল কর্নেলের এবং টাল সামলানোর মৃদু শব্দেই লাল ঘুঘুর ঝাঁক চমকে উঠল। নিঃশব্দে উড়ে গেল।

ওরা উড়ে যাওয়ার মুহূর্তে কর্নেল নিজের পায়ের দিকে তাকিয়েছিলেন। ছাই-রঙা ন্যাকড়াকানির মতো কী একটা জিনিস। কিন্তু পাখিগুলোর দিকেই মন থাকায় বাইনোকুলারটি দ্রুত চোখে রেখেছিলেন। ঝাঁকটি উড়ে চলছে বসতি এলাকার দিকে। গাছ-পালার আড়ালে ওরা উধাও হয়ে গেলে বাঁদিকে পুরনো একটা লালবাড়ি ভেসে উঠল। তারপর চমকে উঠলেন কর্নেল। লালবাড়ির দোতলায় দক্ষিণের বারান্দায় ভিড়। এক দঙ্গল পুলিশ।

তাহলে সত্যিই কিছু ঘটল—এবং এত দ্রুত?

পা বাড়ানোর আগে সেই জিনিসটার দিকে একবার তাকালেন। ন্যাকড়াকানি নয়, একটা ছাই-রঙা পশমি মাফলার। ছেঁড়াফাটা মাফলারটা শিশিরে নেতিয়ে গেছে। তারপর মাকড়সার জাল লক্ষ্য করলেন। জালটাও ছেঁড়া। তার মানে, তাঁর পায়ে জড়িয়ে যাওয়ার সময় পা থেকে ঝেড়ে ফেলেছিলেন। তখন মাকড়সার জালটা ছিঁড়ে গেছে।

একটা ছেঁড়াফাটা মাফলার এখানে পড়ে আছে এবং তার ওপর মাকড়সা জাল বুনেছে, এটা কোনও ঘটনা নয়। এর চেয়ে জরুরি লাল বাড়িটার দোতলার বারান্দায় ভিড় এবং পুলিশ। কর্নেল কী ভেবে মাফলারটি তুলে নিতে গিয়ে একটু দ্বিধায় পড়লেন। নিলেন না। হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে চললেন লালবাড়ির দিকে।

পেছন ঘুরে বাড়িটার গেটে পৌঁছে দেখলেন, ভেতরের লনে পুলিশের গাড়ি এবং একটা অ্যামবুলেন্স গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে। গেটে দুজন কনস্টেবল পাহারা দিচ্ছিল। কর্নেলকে দেখে তারা কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠল। একজন গম্ভীর গলায় বলল—আভি কিসিকো অন্দর যানা মানা হ্যায়, সাব!

কর্নেল নরম গলায় বললেন—কৈ খতরনাক হুয়া, ভাই?

—স্যুইসাইড কেস। কনস্টেবলটি বগলে লাঠি দিয়ে খনি বের করল। তারপর খৈনি ডলতে ডলতে ফের বলল—এক-দো ঘণ্টা বাদ আইয়ে কিসিকো সাথ মুলাকাত মাংতা তো? আভি হুকুম হ্যায়, কৈ চুহা ভি নেহি ঘুসে। সে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে থাকল।

অন্য কনস্টেবলটি বলল—কাঁহা সে আতা হ্যায় আপ?

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বললেন কলকাত্তাসে।

—ইয়ে বাঙ্গালি বাবুকো সাথ আপকা জান পহচান হ্যায়?

—জরুর। দীনগোপালবাবু মেরা দোস্ত হ্যায়।

—তব আপ যানে শকতা। যাইয়ে, যাইয়ে! উনহিকা কৈ ভাতিজা স্যুইসাইড কিয়া—বহৎ খতরনাক!

খৈনি ডলছিল যে, সে গুম হয়ে তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে রইল। কর্নেল সোজা লনে গিয়ে ঢুকলেন। বারান্দায় প্রভাতরঞ্জন দাঁড়িয়ে ছিলেন। কর্নেলকে দেখে অবাক চোখে তাকালেন। দ্রুত বললেন—আপনি?

কর্নেল নমস্কার করে বললেন—আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

প্রভাতরঞ্জন নড়ে উঠলেন। চমক খাওয়া গলায় বললেন—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার? বুঝেছি। তাহলে আপনিই সেই ভদ্রলোক? দীনুদাকে আপনিই-কী আশ্চর্য! মাথা মুণ্ডু কিছু বোঝা যাচ্ছে না। দীপু আর অরুণকে ইরিগেশান বাংলোয় আপনার খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিলুম। ওরা এসে বলল, খবর ঠিক। কিন্তু—কি আশ্চর্য! প্রভাতরঞ্জন এলোমেলো কথা বলছিলেন। কর্নেল্ তাঁকে

থামিয়ে দিয়ে বললেন—কে স্যুইসাইড করেছে শুনলাম ?

—শান্ত। দীনুদার এক ভাইপো। প্রভাতরঞ্জন কর্নেলের আপাদমস্তক দেখতে দেখতে বললেন—কিন্তু আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। এসব কী হচ্ছে, বুঝতে পারছি না। আপনিই বা হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হয়ে দীনুদাকে—আরে! ও মশাই! যাচ্ছেন কোথায় আপনি ?

কর্নেল বসার ঘরে ঢুকে ডানদিকে সিঁড়ি দেখতে পেলেন। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকলেন। পেছনে প্রভাতরঞ্জন তাঁকে তাড়া করে আসছিলেন। গ্রাহ্য করলেন না কর্নেল।

ওপর যেতেই সরডিহি থানার সেকেণ্ড অফিসার ভগবানদাস পাণ্ডে সহাস্যে ইংরেজিতে বলে উঠলেন—আপনাকে এ বাড়িতে দেখে অবাক হয়েছি ভাববেন না কর্নেল! তবে তেমন কিছুই ঘটেনি। নিছক আত্মহত্যা। দীনগোপালবাবু নিরাপদেই আছেন। তাঁর এই ভাইপো সম্পর্কে আমাদের হাতে কিছু খবর অবশ্য আছে। তার আত্মহত্যার কারণ ব্যাখ্যা করা যায়। চূড়ান্ত হতাশা আর কি। পলিটিক্যাল এক্সট্রিমিস্টদের ফ্রাস্ট্রেশন।

দুজন ডোম ততক্ষণে শান্তর মৃতদেহ কড়িকাঠ থেকে নামিয়েছে। কর্নেল ঘরে ঢুকে বললেন—মিঃ পাণ্ডে! জানালাগুলো খোলা হয়নি দেখছি!

—কী দরকার? পাণ্ডে বললেন। —দেখছেন তো, নিছক আত্মহত্যা। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। লাথি মেরে ভাঙা হয়েছে।

কর্নেল দক্ষিণের জানালাটা আগে খুললেন। তারপর খাটের পাশ দিয়ে এগিয়ে পশ্চিমের জানালার কাছে গিয়ে বললেন—মিঃ পাণ্ডে, বডি নিশ্চয় মর্গে পাঠানো হবে ?

—নিশ্চয়। দ্যাটস আ রুটিন ওয়ার্ক।

কর্নেল জানালাটা লক্ষ্য করছিলেন। বললেন—এটা আপনাদের কারুর চোখে পড়া উচিত ছিল, মিঃ পাণ্ডে!

পাণ্ডে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভেতরে ঢুকে বললেন—কী, বলুন তো ?

এই জানালার তিনটে রড নেই।

দীপ্তেন্দু, অরুণ এবং প্রভাতরঞ্জন ব্যাপারটা দেখছিলেন। দীপ্তেন্দু, আস্তে বলল—রডগুলো বরাবরই নেই। জ্যাঠামশাই বাড়ি মেরামত করতে চান না। ওই জানালাটার কথা আমি ওঁকে বলেছিলাম। উনি কান করেননি।

কর্নেল জানালার পাল্লা দুটো ঠেলে দিয়ে বললেন—জানালাটা ভেতর থেকে আটকানো যায় না। ছিটকিনিও কবে ভেঙে গেছে দেখছি।

পাণ্ডে একটু হেসে বললেন—পুরো বাড়িটারই তো এই অবস্থা। কিন্তু হঠাৎ জানালা নিয়ে আপনার মাথাব্যথা কেন, কর্নেল ?

কর্নেল জানালা দিয়ে ঝুঁকে নিচেটা দেখছিলেন। বললেন পাশেই ছাদের পাইপ !

—তাতে কী ? পাণ্ডে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন। —আত্মহত্যার সমস্ত চিহ্ন আমরা এখানে পাচ্ছি। কড়িকাঠের সঙ্গে মাফলারের ফাঁস লটকে শান্তবাবু ঝুলে পড়েছেন। ওই দেখুন, একটা চেয়ার উল্টে পড়ে আছে।

—কোনও স্যুইসাইড নোট পেয়েছেন কি ?

– না। পাণ্ডে বললেন। —সব সময় সবাই লিখে রেখে আত্মহত্যা করে না।

কর্নেল শান্তর মৃতদেহের দিকে তাকালেন। বললেন—এটা আত্মহত্যা নয় মিঃ পাণ্ডে, নিছক খুন। লক্ষ্য করুন, গলায় ফাঁস বেঁধে ঝুললে মানুষের জিভ যতটা বেরিয়ে পড়ার কথা, ততটা বেরিয়ে নেই।

সবাই চমকে উঠেছিল। প্রভাতরঞ্জন মাথা নেড়ে বললেন—কী আশ্চর্য ! তাও তো বটে।

—তাছাড়া এভাবে আত্মহত্যার আরও কিছু স্বাভাবিক চিহ্ন

থাকে। মলমূত্রও বেরিয়ে যায়। একটু রক্তক্ষরণের চিহ্নও থাকে। দম আটকে ফুসফুস ফেটে গেলে সেটাই স্বাভাবিক। কর্নেল পাণ্ডের দিকে ঘুরে বললেন—মিঃ পাণ্ডে, শান্তবাবুকে কেউ খুন করে ঝুলিয়ে রেখে পালিয়ে গেছে। আশা করি ছাদ থেকে নেমে যাওয়া পাইপ পরীক্ষা করলে কিছু সূত্র মিলবে।

নীতা ব্যালকনির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। কর্নেলের কথায় সে মুখ ফেরাল এবং কর্নেলের চোখে চোখ পড়তেই আস্তে বলল—ওই মাফলারটা…

সে হঠাৎ থেমে গেলে কর্নেল বললেন—শান্তবাবুর নয়। তাই না?

প্রভাতরঞ্জন অবাক চোখে ভাগনির দিকে তাকিয়ে বললেন—বলিস কী? কী করে বুঝলি?

নীতা বলল-কাল রাত্তিরে শান্তদার গলায় ওই ডোরা কাটা মাফলার ছিল না।

দীপ্তেন্দু নড়ে উঠল। —মাই গুডনেস! শান্তর গলায় একটা ছাইরঙা মাফলার দেখিছি মনে পড়ছে।

অরুণও বলল দ্যাটস্ রাইট। আমারও মনে পড়ছে। অ্যাশ কালার মাফলার!

বলে সে অতি উৎসাহে শান্তর বিছানার দিকে প্রায় লাফ দিয়ে এগোল। কম্বল উল্টে খাটের তলা চারদিক থেকে খুঁজে তারপর শান্তর কিটব্যাগ হাতড়াতে থাকল। শেষে হতাশ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল।

কর্নেল পাণ্ডের উদ্দেশ্যে বললেন—কিছু ধস্তাধস্তির চিহ্ন স্পষ্ট। শান্তবাবু ঘুমন্ত অবস্থায় খুন হননি। মর্গের রিপোর্টে সবকিছু জানা যাবে। তবে একটা ব্যাপার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তাড়াহুড়ো করে খুনী নিজের মাফলারটাই কাজে লাগিয়েছে। তারপর শান্তর মাফলারটা কারও চোখে পড়ে থাকবে। তার মানে, শান্ত মাফলারটা গলায় জড়িয়ে শুয়ে ছিল না। কেউ শোবার সময় মাফলার গলায় জড়িয়ে রাখে না যদি না তার গলা ব্যথা বা ঠাণ্ডার অসুখ থাকে।

পাণ্ডে সায় দিয়ে বললেন—হ্যাঁ ঠিক বলেছেন।

—মাফলারটা চোখে পড়ার মতো জায়গায় রাখা ছিল! কর্নেল বললেন।

বলে বিবর্ণ দেওয়ালে পেরেক পুঁতে আটকানো একটা ব্র্যাকেটের দিকে আঙুল নির্দেশ করলেন। কাঠের তৈরি জীর্ণ ব্র্যাকেট। এ ধরনের ব্র্যাকেট ভাঁজ করা যায়। একটা দিক মরচে ধরা পেরেক থেকে উপড়ে একটু বেঁকে ঝুলে রয়েছে। অন্যদিকে একটা বাদামি রঙের জ্যাকেট ঝুলছে। জ্যাকেটটা শান্তরই। সেটা কোনোরকমে ঝুলছে মাত্র।

প্রভাতরঞ্জন বললেন—কী আশ্চর্য! আপনার চোখ আছে বটে কর্নেলসায়েব।

কর্নেল প্রশংসায় কান করলেন না। বললেন একঝটকায় মাফলারটা টেনে নিয়ে খুনী পালিয়ে গেছে। ওটা থাকলে এটা স্যুইসাইড কি না, তা নিয়ে কারও সন্দেহ জাগত। খুনী সেই ঝুঁকি নিতে চায়নি।

অরুণ বলল—কিন্তু বডি মর্গে গেলেই তো···

তাকে বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন মর্গের রিপোর্ট পাওয়া সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। ততক্ষণে খুনী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নিপাত্তা হওয়ার সুযোগ পেত।

এবার প্রভাতরঞ্জন বিরক্ত হয়ে বললেন—হেঁয়ালি! কিছু বোঝা যায় না। আমারও মশাই ক্রিমিনলজিতে একটু আধটু পড়াশোনা আছে। রাজনীতি করে জেল খেটেছি বিস্তর। জেলেও ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে মেলামেশার স্কোপ ছিল। কথাটা হলো, প্রতিটি খুনের একটা মোটিভ বা উদ্দেশ্য থাকে। একটা হলো, পার্সোনাল গেন—ব্যক্তিগত লাভ। অন্যটা হলো গিয়ে প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা। হ্যাঁ—হঠাৎ রাগের বশেও মানুষ মানুষকে খুন করে, কিংবা দৈবাৎ নেহাত থাপ্পড় মারলেও মানুষ মারা পড়তে পারে। কিন্তু এটা কোনও ডেলিবারেট মার্ডার নয়।

অরুণ বলল—মামাবাবু, উনি ডেলিবারেট মার্ডারের কথাই বলছেন কিন্তু— মাইণ্ড দ্যাট!

পাণ্ডের তাড়ায় শান্তর মৃতদেহ নিয়ে ততক্ষণে দুজন ডোম এবং কনস্টেবলরা বেরিয়ে গেল। প্রভাতরঞ্জন বললেন—সেটাই তো হেঁয়ালি! শান্তকে কে কী উদ্দেশ্যে খুন করবে?

দীপেন্দু বলল—শান্তর শত্রু থাকা সম্ভব, মামাবাবু! ওর অনেক ব্যাপার ছিল যা আমরা জানি না।

পুলিশ অফিসার বললেন, ওর নামে রেকর্ডস আছে এখানকার থানায়।

কর্নেল ঘরের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখছিলেন। পশ্চিমের জানালায় গিয়ে উঁকি মেরে ফের ছাদের পাইপটা দেখে নিয়ে বললেন—দীনগোপালবাবু কোথায়? ওঁকে দেখছি না যে?

পাণ্ডে বললেন—নিজের ঘরে শুয়ে আছেন। আপনি আসার মিনিট কুড়ি আগে বাইরে থেকে ফিরে এই সাংঘাতিক ঘটনা দেখে ওঁর অবস্থা শোচনীয়। এখন ওঁকে ডিসস্টার্ব করা উচিত হবে না।

—একা আছেন নাকি?

প্রশ্নের জবাব দিল নীতা—না। ঝুমা বউদি আছেন। ডাক্তারবাবু আছেন

পাণ্ডে একটু হেসে বললেন—রুটিন জব, কর্নেল। সঙ্গে ডাক্তার নিয়েই এসেছিলাম। বডি পরীক্ষা করেই বলেছেন, বহুক্ষণ আগেই মারা গেছেন শান্তবাবু।

কর্নেল বললেন—ডাক্তারবাবু কোনও সন্দেহ করেননি?

—না তো। পাণ্ডে গম্ভীর হলেন এবার। —ওঁর কাছেও এ একটা রুটিন জব। কিন্তু আপনি যে পয়েন্টগুলো তুলেছেন, তাছাড়া মাফলারের ব্যাপারটাও গুরুত্বপূর্ণ—তাতে মনে হচ্ছে, কিছু গোলমেলে ব্যাপার আছে। পারিবারিক কোনও ব্যাপার থাকাও স্বাভাবিক।

অরুণ আপত্তি করে বলল—অসম্ভব।

দীপেন্দু বলল অসম্ভব। আমাদের পারিবারিক কোনও গণ্ডগোল নেই।

প্রভাতরঞ্জন জোর দিয়ে বললেন—এই ফ্যামিলির ব্যাকগ্রাউণ্ড

আপনারা-জানেন না। তাই এ প্রশ্ন তুলছেন। তবে আমারও একটা প্রশ্ন আছে মিঃ পাণ্ডে!

বলে তিনি কর্নেলের দিকে আঙুল তুললেন।—এই ভদ্রলোক সম্পর্কে প্রশ্ন।

কর্নেল একটু হাসলেন। বলুন।

—দীনুদা বলছিল, আজ মর্নিং ওয়াকে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আপনি ওঁকে বলেছেন, আমি আপনার হিতৈষী। এর মানেটা কী?

—হিতৈষী শব্দের মানে বরং অভিধানে দেখে নেবেন।

প্রভাতরঞ্জন চটে গেলেন। —আপনি আমাকে অভিধান দেখাবেন না। যেচে পড়ে কলকাতা থেকে এসে কাউকে বেমক্কা 'আমি আপনার হিতৈষী' বলার মানেটা কী? কে আপনি?

পাণ্ডে হাসলেন। কর্নেলের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বললেন—তাহলে আপনার সরডিহিতে আবির্ভাবের কিছু কারণ আছে। যাই হোক, প্রভাতবাবু। আপনি কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের নাম শোনেননি বোঝা যাচ্ছে।

প্রভাতরঞ্জন জোরে মাথা নেড়ে বললেন—না দেশে বিস্তর কর্নেল আছেন।

পাণ্ডে কিছু বলার আগে নীতা বলে উঠল—মামাবাবু, উনি একজন প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ। তাছাড়া উনি যেচে পড়ে এখানে আসেননি। আমিই ওকে বাসস্টপের লোকটার কথা বলে এখানে আসতে অনুরোধ করেছিলাম।

প্রভাতরঞ্জন গুম হয়ে এবং ফোঁস শব্দে শ্বাস ছেড়ে বললেন—তোর পেটে পেটে এত বুদ্ধি। প্রাইভেট গোয়েন্দা লাগিয়েছিস—ভালো। কিন্তু কেমন গোয়েন্দা উনি যে, এই সাংঘাতিক অপঘাত ঠেকাতে পারলেন না? এবার দীনুদার কিছু হলে কি তুই ভাবছিস উনি ঠেকাতে পারবেন?

কর্নেল চুরুট জেলে ব্যালকনিতে গেলেন। বাইনোকুলারে দক্ষিণ-

পশ্চিম কোণে সেই মাফলার-পড়ে-থাকা জায়গাটা দেখতে থাকলেন। নিচু জায়গাটা ঝোপের আড়াল হয়ে আছে। কিন্তু কোথাও কোনও লোক নেই।

পাণ্ডে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—বাসস্টপের লোকটা। ব্যাপারটা কী, কর্নেল?

কর্নেল একটু ভেবে বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন—নীতা, এঁকে ব্যাপারটা আগে তোমার জানানো উচিত ছিল।

পাণ্ডে নীতার দিকে তাকালেন। সেই সময় প্রভাতরঞ্জন বলে উঠলেন—আমি বলছি। সমস্তটাই রীতিমতো রহস্যজনক। পুরো ব্যাকগ্রাউণ্ডটা আপনার জানা দরকার। ...

বাড়ির পশ্চিমে ছাদের পাইপের অবস্থা জরাজীর্ণ। কর্নেল এবং পুলিশ অফিসার পাণ্ডে নিচে গিয়ে লক্ষ্য করছিলেন, তখনও প্রভাত-রঞ্জনের ব্যাকগ্রাউণ্ড বর্ণনা থামেনি। পাণ্ডে পাইপের খাঁজে পা রেখে ওঠার চেষ্টা করতেই ঝরঝর করে খানিকটা মরচে আর চুনবালি ঝরে পড়ল। দেয়াল থেকে হুক উঠে গেল। অমনি প্রভাতরঞ্জন কর্নেলের সামনে হাতমুখ নেড়ে ঘোষণা করলেন—ইউ আর রং কর্নেলসাহেব।

পাণ্ডে তুহাত থেকে ময়লা ঝেড়ে বললেন—হ্যাঁ! এ পাইপ বেয়ে কেউ উঠলে আছাড় খেত। পাইপটাও আস্ত থাকত না।

কর্নেল দোতলায় শান্তর ঘরের জানালার কাছাকাছি পাইপের একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন - পাইপটা আস্ত নেই, মিঃ পাণ্ডে! খানিকটা ভেঙে গেছে।

নিচের দিকে দেয়াল ঘেঁষে ঘন ঝোপ। পাণ্ডে বেটন দিয়ে ঝোপগুলো ফাঁক করে দেখে বললেন—কিছু মরচে ধরা লোহার টুকরো আছে দেখছি। তবে এগুলো আপনা-আপনি খসে পড়তেও পারে।

কর্নেল ঝোপের দিকে ঝুঁকে টুকরোগুলো দেখছিলেন। প্রভাতরঞ্জন তাঁর পাশ গলিয়ে কয়েকটা টুকরো কুড়িয়ে নিলেন। বললেন—আপনি তো মশাই ডিটেকটিভ। ডিটেকটিভদের নাকি অগুনতি চোখ থাকে। আমার মাত্র একজোড়া চোখ। বলুন, এগুলো টাটকা

ভাঙা? এই দেখুন, একটুতেই মুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে। ষাট বছর আগে তৈরি ঢালাই লোহার পাইপ। মরচে ধরে ক্ষয়ে – এই রে! সর্বনাশ!

প্রভাতরঞ্জনের আঙুল কেটে রক্তারক্তি অরুণ, দীপ্তেন্দু, নীতা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিল। অরুণ দৌড়ে এসে বলল এখনই এ টি এস নিন মামাবাবু! মরচে ধরা লোহায় কেটে গেলে টিটেনাস হয় শুনেছি।

পাণ্ডে বললেন—ওপরে ডাক্তারবাবু আছেন। নিশ্চয় তাঁর কাছে এ টি এস পেয়ে যাবেন।

আঙুল চেপে ধরে প্রভাতরঞ্জন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলেন। ঝোপের গায়ে রক্তের ফোঁটা জ্বলজ্বল করছিল। দীপ্তেন্দু বলল—মামাবাবুর সব তাতেই বাড়াবাড়ি। কাল রাত্তিরে কী কাণ্ডটা না করলেন বলো অরুণদা!

পাণ্ডে জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার?

অরুণ গত রাত্তিরের সব ঘটনা বলল। পাণ্ডে একটু হেসে বললেন—আপনাদের এই মামাবাবুর সব ব্যাপারে বড্ড বেশি উৎসাহ দেখছি। একসময় পলিটিক্স করতেন। আমাদের রেকর্ডে আছে।

দীপ্তেন্দু হাসবার চেষ্টা করে বলল—সেটাই তো সমস্যা! পলিটিসিয়ানদের মুখের জোর যতটা, ততটা প্র্যাকটিক্যাল সেন্স থাকে না। অন্তত মামাবাবুর ছিল না। অরুদা, আজ ভোরের মজার ব্যাপারটা বলোনি কিন্তু!

অরুণ বলল জ্যাঠামশাইকে সারা রাত পাহারা দেওয়ার পর ভোর প্রায় চারটে নাগাদ মামাবাবু হুকুম দিলেন, যথেষ্ট হয়েছে। এবার সব শুয়ে পড়ো গে। আমি একা পাহারা দেব। তারপর উনি বসার ঘরের সোফায় দিব্যি শুয়ে পড়লেন। হাতে নবর বল্লম। এদিকে জ্যাঠামশাইয়ের মর্নিং ওয়াকের অভ্যাস আছে। ঘুমন্ত মামাবাবুর হাত থেকে বল্লমটা নিয়ে লনে পুঁতে চলে গেছেন। মামাবাবু টেরও পাননি। হঠাৎ জেগে দেখেন বল্লম নেই। যাই হোক, নব বল্লম

পুঁততে দেখেছিল। নৈলে মামাবাবু হুলুস্থুল বাধিয়ে দি.তন ফের।

দীপ্তেন্দু বলল—বাধিয়েও ছিলেন। আমাদের ডেকে তুলে সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড।

পাণ্ডে বললেন—শান্তবাবু গণ্ডগোল শুনে নেমে আসেননি তখন?

নীতা মৃদু স্বরে বলল—নিচে হৈচৈ শুনে আমি শান্তদার ঘরের দরজায় নক করেছিলাম। ডেকেছিলামও। সাড়া পাইনি। তখন ছটা বেজে গেছে।

—তার মানে, তখন শান্তবাবু আর বেঁচে নেই! পাণ্ডে কথাটা কর্নেলের উদ্দেশে বললেন।

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বললেন—ঠিক তাই।

পাণ্ডে বললেন—যদি মর্গের রিপোর্টে দেখা যায় এটা সত্যিই মার্ডার, তাহলে তো ব্যাপারটা অদ্ভুত হয়ে ওঠে। শান্তবাবুর ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। এদিকে আপনি বলছেন, খুনী এই পাইপ বেয়ে পালিয়েছে। কিন্তু পাইপের অবস্থা তো দেখছেন। ধরা যাক, খুনী কাল রাত্তিরে কোনও সুযোগে শান্তবাবুর ঘরে ঢুকে খাটের তলায় লুকিয়ে ছিল। তারপর কাজ শেষ করে এই পাইপ বেয়ে নেমে গেছে। কিন্তু নামতে গেলে পাইপ ভেঙে পড়তই।

কর্নেল বললেন—পুরোটা ভেঙে পড়েনি। কিন্তু খানিকটা ভেঙেছে।

বলে কর্নেল বাইনোকুলারে পাইপটার ওপরদিকটা দেখতে থাকলেন। কিছুক্ষণ দেখার পর বাইনোকুলারটা পাণ্ডের হাতে গুঁজে দিলেন। —দেখুন! দেখলেই বুঝবেন, আমি ঠিকই বলেছি।

পাণ্ডে বাইনোকুলারে পাইপের ওপরদিকটা দেখে হাসতে হাসতে বললেন--বিশাল স্তম্ভ!

—ভাঙা অংশটা দেখুন।

—দেখছি। বিশাল গহ্বর।

—হ্যাঁ। কিন্তু বিশাল গহ্বরের কিনারা লক্ষ্য করুন।

—করছি।

—কিছু বুঝতে পারছেন না ?

—না তো !

—মিঃ পাণ্ডে, কিনারার রঙ ঘন কালো নয় কি ?

হ্যাঁ। ঘন কালো। বলে পাণ্ডে বাইনোকুলার কর্নেলকে ফিরিয়ে দিলেন। চাপা শ্বাস ফেলে ফের বললেন– বুঝেছি টাটকা ভাঙা। তা না হলে কিনারাতেও মরচে ধরে এমনি লালচে হয়ে থাকত।

কর্নেল প্রজাপতি ধরা জালের স্টিক নিচের একটা ঝোপের পাতায় ঠেকিয়ে বললেন—প্রভাতবাবুর যেমন আঙুল কেটে রক্ত পড়ল, খুনীরও সম্ভবত আঙুল কেটে গিয়েছিল মিঃ পাণ্ডে ! এই কালচে লাল ফোঁটাগুলো হঠাৎ দেখলে মনে হবে পাতার স্বাভাবিক ফুটকি বা ছোপ ! নানা প্রাকৃতিক কারণে উদ্ভিদের পাতায় এমন স্পট পড়ে। কিন্তু এগুলো তা নয়, রক্ত। খুনীরই রক্ত।

পাণ্ডে ঝোপের পাতাগুলো দেখছিলেন। বললেন—রক্ত বলেই মনে হচ্ছে। আশেপাশে আর কোনও ঝোপের পাতায় এমন ছোপ নেই।

কর্নেল বললেন—মরচে ধরা পাইপের রঙের সঙ্গে রক্তের ছোপ মিশে গেছে। তাই পাইপের গায়ে রক্তের ছোপ খালি চোখে ধরা পড়ছে না ! কিন্তু আমার বাইনোকুলারে ধরা পড়েছে।

পাণ্ডে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবার।—খুনীকে সনাক্ত করার মতো একটা চিহ্ন পাওয়া গেল। বলে পা বাড়িয়ে হঠাৎ ঘুরে একটু হাসলেন।—কিন্তু যদি মর্গের রিপোর্ট বলে যে, নিছক দম আটকেই মারা গেছেন শান্তবাবু ? স্রেফ সুইসাইড ?

কর্নেল আস্তে বললেন দেখা যাক। তারপর তিনি লনের দিকে চললেন।

ততক্ষণে অ্যামবুলেন্সে শান্তর মৃতদেহ হাসপাতালে চলে গেছে। পুলিশ অফিসার পাণ্ডে কর্নেলের উদ্দেশে হাত নেড়ে চলে গেলেন। গেটের সেপাই দুজন তাঁর জিপের পেছনে উঠে বসল। জিপটা চলে গেল। দীপ্তেন্দু, অরুণ ও নীতা সামনের লনে কর্নেলকে ঘিরে দাঁড়াল।

অরুণ বলল—আমার একটা থিওরি আছে কর্নেল সরকার!

-- বলুন।

—এটা একটা মার্ডার ট্র্যাপ। খুনের ফাঁদ। কেউ শান্তকে খুন করতে এই ফাঁদটি তৈরি করেছিল, অবশ্য যদি এটা সত্যিই খুনের কেস হয়।

দীপ্তেন্দু তাকে সমর্থন করে বলল—আমারও তাই মনে হচ্ছে। এখানে আমাদের সবাইকে জড়ো করে কেউ শান্তকে খুন করলে পুলিশ স্বভাবত আমাদেরই কাউকে-না-কাউকে সন্দেহ করবে।

কর্নেল বললেন—কেন?

—জ্যাঠামশাইয়ের প্রপার্টির আমরাই উত্তরাধিকারী। দীপ্তেন্দু যুক্তি দেখিয়ে বলল।—সংখ্যায় একজন কমলে বাকি উত্তরাধিকারীদের শেয়ার কিছুটা বাড়বে। পুলিশ তো এই লাইনেই দেখবে ব্যাপারটা।

অরুণ একটু হাসল।—অবশ্য পুলিশের রেকর্ডে শান্তর অনেক কীর্তি লিস্ট করা আছে। কলকাতা থেকে আরও রেকর্ড আনাবে। তবে আমি যা বলছিলাম, মার্ডার ট্রাপ! এখানে—মানে জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে শান্তকে মার্ডার করা সোজা। নিরিবিলি জায়গা। যে কোনও সময় ওকে একলা পেয়ে যাবার চান্স বেশি।

নীতা বলল কিন্তু আমাদের সবাইকে এখানে ডেকে জড়ো না করে শুধু শান্তকে একা ডাকতে পারত। বাস স্টপের লোকটার কথা ভুলে যাচ্ছ অরুদা!

—ভুলিনি। ওই লোকটাই তো ফাঁদ। অরুণ গলা চেপে বলল। —আমাদের এখানে জড়ো করার উদ্দেশ্য হলো—দীপু যা বলছিল, আমাদর ঘাড়েই দোষ চাপানো।

দীপ্তেন্দু বলল—নীতু, তুই এই প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোককে এনে ভাল করেছিস। তোর বুদ্ধি আছে। আমরা জানি, শান্তকে আমরা কেউ খুন করিনি। বলে সে কর্নেলের দিকে তাকাল।—আমরা চাই, যদি সত্যি শান্ত খুন হয়ে থাকে, আপনি খুনীকে বের করুন। আপনার ফি একা নীতু কেন দেবে? আমরা সবাই শেয়ার করব। কী অরুদা?

অরুণ বলল – নিশ্চয় !

কর্নেল বাইনোকুলারে আকাশে হাঁসের ঝাঁক দেখতে থাকলেন। নীতা চোখ টিপে আস্তে বলল—উনি ফি নেন না। ফি নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না।

এতক্ষণে ডাক্তারবাবুকে বেরুতে দেখা গেল। ঢ্যাঙা মানুষ, একটু কুঁজো হয়ে হাঁটেন। নবর হাতে তাঁর ডাক্তারি ব্যাগ। কর্নেলকে আড়চোখে দেখতে দেখতে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন গেটের দিকে। নবও যেতে যেতে কয়েকবার ঘুরে কর্নেলকে দেখছিল।

ওপরে দীনগোপালের ঘরের জানালায় প্রভাতরঞ্জনকে দেখা গেল। বললেন—অরু! ডিটেকটিভ ভদ্রলোককে বল, দীনুদা কথা বলবেন। ও মশাই! দয়া করে একটু দর্শন দিয়ে যান।

মুখে তেতো ভাব। গলার স্বর ঝাঁঝালো। নীতা দ্রুত বলল—মামাবাবু ওইরকম মানুষ, কর্নেল! প্লিজ, ওঁর কোন কথায় অফেন্স নেবেন না।

কর্নেল হাসলেন।—না, না। ব্যর্থ রাজনীতিকদের আমি খুব চিনি।

অরুণ ও দীপ্তেন্দু এক গলায় সায় দিয়ে বলল—ঠিক বলেছেন।···

দোতলায় পুবদিকের ঘরটা বেশ বড়। সেকেলে আসবাবপত্রে ঠাসা। প্রকাণ্ড খাটে কয়েকটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে ছিলেন দীনগোপাল। খাটের পাশে জানালার কাছে একটা গদি আঁটা চেয়ারে প্রভাতরঞ্জন। দুই হাতের আঙুলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কর্নেল ঢুকলে দীনগোপাল বাঁকা মুখে বললেন—হিতৈষী মশাইয়ের বসতে আজ্ঞা হোক। নীতু, তুইও বস। দীপু, অরু! তোরা এখন ভিড় করিস নে। মর্গে গিয়ে ছাখ গে কী হচ্ছে। আর বউমা, নব বোধ করি ডাক্তারবাবুকে পৌঁছে দিতে গেছে—তুমি চা বা কফি যাই হোক, এক পট তৈরি করে আনো।

ঝুমা চলে গেল। তার পেছনে অরুণ ও দীপ্তেন্দু। কর্নেল বসলেন দরজার কাছে একটা চেয়ারে।

দীনগোপাল বললেন - নীতু! তুই গোয়েন্দা ভাড়া করেছিস শুনলাম!

নীতা মুখ নামাল।

—তোর গোয়েন্দামশাই আমার হিতৈষী। খুব ভালো! দীনগোপাল আরও বাঁকা মুখে বললেন।—তখন আমাকে অমন একটা উটকো প্রশ্ন করলেন কেন, জিজ্ঞেস কর তো তোর গোয়েন্দামশাইকে।

নীতা বলল—কী প্রশ্ন?

কর্নেল মুখে কাঁচুমাচু ভাবে ফুটিয়ে বললেন - নিছক একটা কথার কথা! এ বয়সে এখানে একলা আছেন—দেখাশোনার লোক নেই, মানে আত্মীয়-স্বজনের কথাই বলছি আর কী! স্রেফ কৌতূহল মাত্র!

—থামুন! দীনগোপাল ধমকের স্বরে বললেন।—এতক্ষণে বুঝতে পারছি, কিছুদিন ধরে আপনিই আমাকে ফলো করে বেড়াচ্ছেন। ঝোপে ঝাড়ে, গাছপালার আড়াল থেকে। এদিকে নীতু ব্যাপারটা দিব্যি চেপে রেখে আমাকে ভোগাচ্ছিল।

নীতা ব্যস্তভাবে বলল—না জ্যাঠামশাই! আমি তো কর্নেলের সঙ্গে আমার আসার আগের দিন কনট্যাক্ট্ করেছি। আর আপনি হ্যালুসিনেশান দেখছেন তার কতো আগে থেকে।

দীনগোপাল কর্নেলকে চার্জ করলেন—কী মশাই? নীতু ঠিক বলছে?

কর্নেল বললেন—একেবারে ঠিক। আজ তেসরা নভেম্বর। নীতা আমার কাছে গিয়েছিল ৩০ অক্টোবর।

দীনগোপাল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন—শুনলাম আপনি বলেছেন শান্ত স্যুইসাইড করেনি। খুনী আগে থেকে লুকিয়ে ছিল। শান্তকে মেরে কড়িকাঠে লটকে ভাঙা জানালা দিয়ে পালিয়েছে—পাইপ বেয়ে!

—হ্যাঁ, দীনগোপালবাবু। ঠিক তাই।

কিন্তু প্রভাত বলছে, পাইপের যা অথবা পুরোটা ভেঙ্গে পড়ার কথা। পুলিশও তাই নাকি বলছে। দীনগোপাল চোখ বুজে ঢোক

গিলে শোক দমন করলেন। ভাঙা গলায় ফের বললেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এসব কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে! শান্ত যদি স্যুই-সাইড করে—এখানে এসে কেন করবে? যদি কেউ তাকে খুন করে থাকে—তাই বা কেন করবে? আর কলকাতার বাসস্টপে কেন কোন ব্যাটাচ্ছেলে আমার ভাইপো-ভাইঝিদের বলে বেড়াবে আমার বিপদ, সরডিহি চলে যাও?

প্রভাতরঞ্জন বললেন—তোমার ব্যাপারটা সম্ভবত হ্যালুসিনেশন নয় দীনুদা। এটাও একটা রহস্য। একেবারে গোলকধাঁধায় পড়া গেল দেখছি।

বলে কর্নেলের দিকে কটাক্ষ করলেন।—নীতা ডিটেকটিভ এনেছে। দেখা যাক, উনি কিছু জট ছাড়াতে পারেন নাকি।

কর্নেল একটু হাসলেন!—জটের খেই যতক্ষণ অন্যের হাতে, ততক্ষণ আমি নিরুপায় প্রভাতবাবু।

প্রভাতরঞ্জন ভুরু কুঁচকে বললেন—কার হাতে?

—একটা লোকের হাতে—আমি সিওর নই। তবে তাই মনে হচ্ছে।

প্রভাতরঞ্জন দীনগোপালের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন—সে আবাব কে?

—সম্ভবত যে আড়াল থেকে দীনগোপালবাবুকে এক সপ্তাহ ধরে ফলো করে বেড়াচ্ছে।

দীনগোপাল সোজা হয়ে বসে বললেন—কেন ফলো করে বেড়াচ্ছে?

—এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র আপনিই দিতে পারেন, দীনগোপাল-বাবু!

দীনগোপাল চটে গেলেন।—পারি না। কারও পাকা ধানে এই-ইহ জীবনে আমি মই দিইনি!

কর্নেল একটু চুপ করে থেকে বললেন—মানুষের জীবনে এটাই ঘটে থাকে দীনগোপালবাবু! নিজেই জানে না যে, সে কী জানে।

অর্থাৎ নিজের অগোচরে মানুষ কিছু ইনফরমেশন বা তথ্য বয়ে নিয়ে বেড়ায় এবং নিজের অগোচরে সেই তথ্য ফাঁস করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বসে। তখন সেই তথ্য যার পক্ষে বিপজ্জনক, সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। বাধা দিতে মরিয়া হয়।

দীনগোপাল কান করে শুনছিলেন। শ্বাস ছেড়ে বললেন—ফিলসফি! আপনি শুধু গোয়েন্দা নন, দেখছি ফিলসফারও বটে! খুব ভাল গোয়েন্দা এনেছে নীতু। লেগে পড়ুন আদা জল খেয়ে।

প্রভাতরঞ্জন বললেন—না দীনুদা। ওঁর কথাটা ভাববার মতো।

—তুমিও তো ফিলসফার। ভুলে গিয়েছিলাম কথাটা।

প্রভাতরঞ্জন জোরে মাথা নেড়ে বললেন—উঁহু হুঁ হুঁ! ফিলসফি নয়, ফিলসফি নয়। প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার।

দীনগোপাল একটু চটে গিয়ে বললেন—কী প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার? আমি এমন কিছু জানি না, যা কারও পক্ষে বিপজ্জনক। আমি এমন নতুন কিছু করে যাচ্ছি না যে তাতে কারও বিপদ ঘটবে। যদি বা জানি কিংবা নতুন কিছু করি, তাতে শান্তর বিপদ কেন ঘটল?

—আহা, না জেনেও তো কত লোক সাপের মাথায় পা দেয়।

দীনগোপাল আরও চটে বললেন—মলো ছাই! কোথায় শান্ত কিসে পা দিল? আর আমি পা দিতে যাচ্ছি কোথায়? একটা চোখে একটু ছানি পড়েছে বলে আমি কি কানা?

প্রভাতরঞ্জন মিঠে গলায় বললেন—সেবার তুমি বলছিলে উইলের কথা ভাবছ। আমি তোমাকে বললাম, কাউকে বঞ্চিত না করে উইল করো। তুমি বললে, দেখা যাক। তুমি নীতুকে বেশি স্নেহ করো, জানি। নীতু আমারই ভাগনি। তো—এমনও হতে পারে তুমি নীতুর নামে উইল করবে প্ল্যান করেছ, এতেই কারুর ব্যাঘাত ঘটতে চলেছে।

সেটা সাপের মাথায় পা দেওয়া হলো বুঝি? দীনগোপাল অন্য-মনস্কভাবে বললেন—উইলের প্ল্যান করার কথা ঠিকই। অ্যাটর্নির সঙ্গে কথাবার্তা পাকা। কিন্তু ধরো, সম্পত্তি যার নামেই দিই, তাতে

কার কি তথ্য ফাঁস হবে? তাছাড়া দীপু, অরু, ওদের বাপের প্রচুর পয়সা। ওরা আমার কানাকড়ির মুখ চেয়ে নেই। শান্তর অবশ্য পয়সা কড়ি ছিল না। কিন্তু সে পয়সাকড়ির ধারই ধারত না। তাছাড়া সে এখন বেঁচে নেই।

প্রভাতরঞ্জন গুম হয়ে বললেন - হুঁ, দুটোকে লিংক আপ করা যাচ্ছে না! কর্নেলসাহেব! বলুন এবারে? আপনিই কিন্তু হিন্ট দিয়েছেন।

কর্নেল কী বলতে যাচ্ছেন, দীনগোপাল পুবের জানালার দিকে সরে গিয়ে আচমকা হাঁক দিলেন—কে ওখানে?

প্রভাতরঞ্জন হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে উঁকি দিলেন। কর্নেলও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বাইনোকুলারে চোখ রেখে এগিয়ে গেলেন। ঘন গাছপালার জঙ্গল হয়ে আছে ওদিকটাতে। তার ওধারে টালি-খোলার বস্তি। আরও গাছ। মাঝে মাঝে পোড়ো খালি জমি এবং নতুন দোতলা-একতলা বাড়ি।

দীনগোপাল অভ্যাস মতো আস্তে বললেন—হ্যালুসিনেশন! তারপর ঠোঁটের কোণায় বাঁকা হেসে কর্নেলের উদ্দেশে বললেন—আপনার সেই আড়ালের লোকটাকে দেখতে পাচ্ছেন না দূরবীনে?

কর্নেল তখনও তন্নতন্ন খুঁজছেন। কোনও জবাব দিলেন না। পাঁচিলের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটা অংশ ভাঙা। সেখানে ডালপালা দিয়ে বেড়া করা হয়েছে। বাইনোকুলারে এক পলকের জন্য বেড়ার ফাঁক দিয়ে একটা কালো কুকুরের মুখ বিশাল হয়ে ভেসে উঠল, প্রকাণ্ড লকলকে জিভ। তারপরই ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হলো। একটু পরে আবার কুকুরটা দেখা গেল এক সেকেণ্ডের জন্য। বাইনোকুলারে সবকিছুই বড় আকারে দেখা যায়। কুকুরটা আরেকটা ঝোপের আড়ালে চলে গেল।

প্রভাতরঞ্জন ব্যস্তভাবে চাপা স্বরে বললেন—কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখেই বললেন—হ্যাঁ। একটা কালো রঙের কুকুর।

কালো কুকুর! দীনগোপাল চমকে ওঠা গলায় বললেন।—হুঁ নব বলেছিল বটে।

কালো কুকুরটা অ্যালসেশিয়ান বলে মনে হয়েছিল কর্নেলের। এবার ফাঁকা জায়গায় তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। পশ্চিম দিকে হেঁটে চলেছে। উঁচু-নীচু মাঠে কখনও আড়াল হয়ে যাচ্ছে কুকুরটা। কর্নেল ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে বারান্দায় গেলেন। তারপর আবার বাইনোকুলারে কুকুটাকে খুঁজলেন। দেখতে পেলেন না আর। কিন্তু এবার খোলামেলা একটা উঁচু জমির মাঝখানে একটা বেঁটে গাছের কাছে একটা লোক দেখতে পেলেন।

রোদে কুয়াশা মেখে আছে। তার ভেতরে আবছা ভেসে উঠল লোকটার চেহারা। খোঁচা-খোঁচা দাড়িগোঁফ, মাথায় মাফলার জড়ানো, পায়ে খাকি রঙের সোয়েটার-মোটেও ধোপদুরস্ত নয়, পরনে যেমন তেমন একটা ফুল প্যান্ট।

এরকম কোনও লোক সরডিহির মাঠে ঘোরাফেরা করতেই পারে। কিন্তু কালো অ্যালসেশিয়ানটা তার কাছে পৌঁছুতেই ঘটনাটি তাৎপর্য পেল।

কুকুরটা আর লোকটা তখনই জমিটার ঢালে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রভাতরঞ্জন কর্নেলের কাছে এসে আগের মতো ব্যস্তভাবে বললেন—কুকুরটাকে ফলো করছেন? কোথায় যাচ্ছে?

কর্নেল কোনও জবাব দিলেন না। ঝুমা কফির ট্রে নিয়ে এল এতক্ষণে। কর্নেল চোখ থেকে বাইনোকুলার নামিয়ে ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন, দীনগোপাল বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছেন। চোখ বন্ধ। মুখ ভীষণ গম্ভীর। কর্নেল ডাকলেন—দীনগোপালবাবু!

চোখ না খুলেই দীনগোপাল বললেন—বলুন।

—আমি আপনার কাছেই কিছু শোনার আশা করছিলুম।

—কী ব্যাপার?

—কালো কুকুরটার ব্যাপারে।

দীনগোপাল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। রুক্ষ স্বরে বললেন

—আপনি তো গোয়েন্দা ! আপনিই খুঁজে বের করুন, দেখি আপনার বাহাদুরি।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন—কুকুরটার মালিককেও আমি দেখতে পেয়েছি, দীনগোপালবাবু! ভদ্রলোক মাঠে অপেক্ষা করছিলেন —কুকুরটাকে পাঠিয়ে রোজকার মতোই আপনাকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন।

দীনগোপাল তাকিয়ে রইলেন। কিছু বললেন না। ঝুমা চুপচাপ কফির পেয়ালা তুলে দিচ্ছিল প্রত্যেকের হাতে। প্রভাতরঞ্জন কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বোঝা যায় না! আড়ালের কোনো লোকের কথা বলছিলেন? সেই লোক নাকি? কে সে? বলে দীনগোপালের দিকে ঘুরলেন।—ও দীনুদা, একটু ঝেড়ে কাশো তো! এ যে বড্ড হেঁয়ালিতে পড়া গেল দেখছি।

দীনগোপাল ধমক দিলেন।—চুপ করো তো। সব তাতে নাক গলানো অভ্যাস খালি।

প্রভাতরঞ্জন গুম হয়ে গেলেন। একটু পরে আস্তে বললেন—নাক কি সাধে গলাচ্ছি? আমার মাথার ভেতরটায় চর্কির মতো কী ঘুরছে। যন্ত্রণা শুরু হয়েছে মাথায়।

কর্নেল বললেন—আপনার হাতেও।

প্রভাতরঞ্জন চমকে উঠে বললনে—কী? তারপর বিষণ্ণ হাসলেন। —হ্যাঁ, হাতেও ব্যাথা।···

## ॥ চার ॥

সরডিহি সেচ বাংলো বিশাল জলাধারের ধারে একটা টিলা জমির ওপর তৈরি। জলাধারটি পাখিদের স্যাংচুয়ারি বলা চলে। লাঞ্চের পর কর্নেল লনে ইজিচেয়ার পেতে বসে জলাধারের পাখি দেখছিলেন। এখনই হিমালয় ডিঙিয়ে সাইবেরিয়ার হাঁসের ঝাঁক আসতে শুরু করেছে। সারা শীত এখানে কাটিয়ে তারা আবার স্বদেশে ফিরে

যাবে। একটি জলটুঙ্গির ওপর ঘন জঙ্গল। উঁচু মগডালে অদ্ভুত চেহারার সারস জাতীয় একটা পাখি বসে আছে। বাইনোকুলারে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করার পর কর্নেল চিনতে পারলেন. ওটা 'কেরানী পাখি' ইংরেজিতে 'সেক্রেটারি বার্ড বলা হয়। এ পাখি এখন দুর্লভ প্রজাতির হয়ে উঠেছে। দ্রুত ক্যামেরা নিয়ে এলেন তাঁর রুম থেকে। টেলিলেন্স ফিট করে ছবি তুলতে যাচ্ছেন, পাখিটা হঠাৎ নিচের ডালে সরে গেল।

হতাশ মুখে ক্যামেরা নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন সময়ে বাংলোর গেটের দিকে গাড়ির শব্দ। ঘুরে দেখলেন পুলিশের জিপ। চৌকিদার রামলাল দৌড়ে গিয়ে গেট খুলে দিল।

জিপটা প্রাঙ্গণে ঢুকল এবং নেমে এলেন সরডিহি থানার অফিসার-ইন-চার্জ গণেশ ত্রিবেদী। একা এসেছেন। কর্নেলকে সম্ভাষণ করে হাসতে হাসতে বললেন—হ্যাল্লো ওল্ড বস! আপনি দেখছি সত্যিই পূর্ব জন্মে শকুন ছিলেন! কাল বিকেলে দর্শন দিয়ে যখন বললেন, 'স্রেফ সাইট-সিইং, তখনও অবশ্য মনে মনে একটু সন্দেহ জাগেনি, এমম নয়। কারণ সত্যিই যদি এটা নিছক সাইট-সিইং হয়, তাহলে কেন থানায় গিয়ে নিজের উপস্থিতি জানাতে এত ব্যগ্র? তার মানে, ইউ নিড পোলিস হেল্প! ওকে? তারপর দেখছি সত্যি একটা বডি পড়ল।

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে বললেন—মর্গের রিপোর্টে বলছে কি শান্তকে খুন করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল?

ত্রিবেদীকে লনে বসতে একটা চেয়ার এনে দিয়েছে রামলাল। বসে বললেন—হ্যাঁ। মারাত্মক নিকোটিন ইঞ্জেকশান করা হয়েছিল। ডান বাহুতে সোয়েটার আর শার্টের ভেতর ইঞ্জেকশনের চিহ্ন রয়েছে। একটু চুপ করে থেকে ফের বললেন—আপনার ধারণা খুনী আগেই খাটের তলায় অপেক্ষা করছিল। জানালা খুলে পাইপ বেয়ে পালিয়ে যায়। তাই কি?

কর্নেল ইজি চেয়ারে বসে বললেন—ঠিক তাই। রাত্রে দীনগোপালবাবুর বাড়ি পাহারা দিতে সবাই নিচে ছিলেন। তখন

নিশ্চয় ওপরে শান্তর ঘরের দরজা খোলা ছিল। শুনলাম রাত্রে ওঁরা সবাই একটু সন্দেহজনক শব্দেই বাইরে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছেন। সেই সময় কোনও সুযোগে খুনী ওপরে উঠে গিয়েছিল।

—কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করুন। ত্রিবেদী বললেন—শান্তবাবুকে কড়িকাঠে ঝোলানো একজনের পক্ষে সম্ভব কিনা? ওঁর যা বডি ওয়েট, তাতে ওঁকে ওভাবে লটকাতে হলে রীতিমতো একজন 'অরণ্যদেব' হওয়া দরকার। একা কারুর পক্ষে এটা কি সম্ভব?

কর্নেল চুরুট জ্বেলে বললেন—হুঁ, সেটা আমি ভেবেছি। খুনীর একজন সঙ্গী থাকা অবশ্যই দরকার।

—তাহলে দুজন লোক শান্তবাবুর ঘরে লুকিয়ে ছিল!

কর্নেল একটু হাসলেন। —আপাতদৃষ্টে খুনীর একজন সহকারীর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যাচ্ছে না, এটুকু বলা চলে।

ত্রিবেদী চোখে ঝিলিক তুলে রহস্যের ভঙ্গিতে বললেন—যাই হোক, আমার একটুখানি ব্যাকগ্রাউণ্ড জানা দরকার।

—কিসের?

পাণ্ডের কাছে শুনলাম, দীনগোপালবাবুর ভাইঝি নীতা দেবীই আপনার এখানে আগমনের কারণ। 'বাস স্টপে একটা লোক'—এপিসোডটাও জানা জরুরি।

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন—এই এপিসোড সম্পর্কে মিঃ পাণ্ডে আপনাকে যতটুকু বলেছেন, আমিও ততটুকু জানি। আর নীতার ব্যাপারটা বুঝতেই পারছেন। বাস স্টপে একটা লোক ওর জ্যাঠামশাইয়ের বিপদের কথা বলায় খুব ভয় পেয়ে আমার কাছে যায় এবং সাহায্য চায়। তবে…

তাঁকে আবার চুপ করতে দেখে ত্রিবেদী ব্যস্তভাবে বললেন—বলুন কর্নেল!

—গত বছর অক্টোবরে যখন এখানে বেড়াতে আসি, তখন আপনি কথায় কথায় সরডিহি রাজবাড়ির মন্দির থেকে বিগ্রহ চুরি যাওয়ার ঘটনা বলেছিলেন।

ত্রিবেদী একটু অবাক হয়ে বললেন—হ্যাঁ! কিন্তু সে তো প্রায় দুবছর আগের কেস। এখনও সে বিগ্রহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ওপর মহলের ধারণা, আর তা উদ্ধারের আশা নেই। কারণ মূর্তিটা নিরেট সোনার এবং প্রায় হাফ কিলোগ্রাম ওজন। চোর যাকে বেচেছিল, সে হয়তো গলিয়ে ফেলেছে সোনাটা। গয়না হয়ে কত সুন্দরীর শরীরে ঝলমল করছে এতোদিনে। কিন্তু এ কেসের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?

ত্রিবেদী হাসতে লাগলেন। কর্নেল বললেন—বিগ্রহটি ছিল নৃসিংহদেবের। তাই না?

—হ্যাঁ, কিন্তু···

অর্থাৎ মুখটা সিংহের, শরীর মানুষের।

ত্রিবেদী হতাশ ভঙ্গিতে দুহাত চিতিয়ে বললেন—ওঃ কর্নেল! আপনি বড্ড হেঁয়ালি করতে ভালবাসেন।

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার ভেতর বললেন—নীতা আমার সম্পর্কে ওরা কোনও এক বন্ধুর কাছে নাকি শুনেছিল। তো ওকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওর জ্যাঠামশাইয়ের কী বিপদ হতে পারে সে ভাবছে? যেন ও একটা অদ্ভুত কথা বলল। দু'বছর আগে·

ত্রিবেদী কান করে শুনছিলেন। বললেন—বলুন প্লিজ! থামবেন না।

—দু'বছর আগে, ওর জ্যাঠামশাইয়ের কাছে নীতা বেড়াতে এসেছিল। সঙ্গে ওর স্বামী প্রসূনও ছিল। হনিমুন বলাই উচিত। তো একদিন নীতা আর প্রসূন সন্ধ্যা অব্দি বাইরে ঘুরে এসে সোজা ওপরে জ্যাঠামশাইয়ের ঘরে যায় প্রসূন পেছনে ছিল, নীতা সামনে। নীতা লক্ষ্য করে, ওর জ্যাঠামশাই একটা ছোট্ট ধাতুমূর্তি হাতে নিয়ে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় কী যেন পরীক্ষা করছেন। নীতার পায়ের শব্দেই উনি মূর্তিটা লুকিয়ে ফেলেছিলেন। মাত্র এক পলকের দেখা। তবে নীতা দেখেছিল, মূর্তিটার মুখ মানুষের নয়—কোনও জন্তুর। তাছাড়া ওর বিশ্বাস, মূর্তিটা সোনার।

ত্রিবেদী সোজা হয়ে বসে বললেন—মাই গুডনেস! তাহলে তো এখনই অ্যাকশন নিতে হয়, কর্নেল!

কর্নেল হাসলেন। —একটু ধৈর্য ধরতে হবে মিঃ ত্রিবেদী।

এই সময় বাংলোর চৌকিদার রামলাল কফি নিয়ে এল। কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ত্রিবেদী তার উদ্দেশে বললেন—ঠিক হ্যায়! তুম আপনা কামমে যাও।

রামলাল ঝটপট সরে গেল। সরডিহি থানার হুঁদে অফিসার-ইন-চার্জের ভয়ে ইঁদুরও গর্তে সেঁধিয়ে থাকে, তো সে এক নাদান আদমি। সে বাংলোর পেছন দিকটায় চলে গেল।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—রামলাল খুব সজ্জন লোক, মিঃ ত্রিবেদী! আমার ধারণা, আপনাদের থানার রেকর্ডে ওর নামে কিছু নেই।

—বলা যায় না! ত্রিবেদী হাসছিলেন। —সরডিহি এলাকায় সজ্জন মানুষ বলতে জানতাম একমাত্র ওই বাঙালী ভদ্রলোককে। কিন্তু আপনার কাছে যা শুনলাম, মনে হচ্ছে, এখানকার মাটিতেই ক্রাইমের জীবাণু থকথক করছে।

কর্নেল একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—রাজবাড়ির নৃসিংহ-মূর্তি দীনগোপালবাবু নিজে চুরি নাও করতে পারেন। দৈবাৎ তাঁর হাতে আসাও স্বাভাবিক।

—তাহলে উনি তখনই থানায় জমা দিলেন না কেন?

—এখানেই রহস্যের একটা জট রয়ে গেছে, মিঃ ত্রিবেদী! কর্নেল আস্তে বললেন। —নীতাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ও জ্যাঠামশাইয়ের কাছে এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলেছিল কিনা? নীতা বলল, জ্যাঠামশাই রাগী মানুষ। কাজেই যে জিনিসটা উনি ওদের সাড়া পেয়েই লুকিয়ে ফেলেছেন, তা নিয়ে কথা তুলতে ভরসা পায়নি। তখন আমি বললাম, মূর্তিটা কি প্রসূনও দেখতে পেয়েছিল? না পেলে নীতা কি ওটার কথা পরে তাকে বলেছিল? নীতা জোর গলায় বলল, সে প্রসূনকে ব্যাপারটা বলেনি। আর তার বিশ্বাস,

প্রসূন কিছু দেখতে পায়নি। পেলে নিশ্চয় সে নীতার কাছে কথাটা তুলত। যাই হোক! নীতা বলল, তার জ্যাঠামশাই নাস্তিক মানুষ। অথচ তাঁর কাছে একটা সোনার ঠাকুর – সেটা উনি লুকিয়ে রেখেছেন! এ থেকে নীতার বিশ্বাস, ওই সোনার ঠাকুরের জন্যই ওর জ্যাঠামশাইয়ের কোনও বিপদ হতে পারে।

ত্রিবেদী সিগারেট জ্বেলে বললেন – বুঝলাম। কিন্তু বাসস্টপের লোকটাই বা কে? মনে হচ্ছে, সে দীনগোপালবাবুর হিতৈষী এবং যেভাবেই হোক জানতে পেরেছে যে, সোনার ঠাকুরের জন্য ওঁর বিপদ ঘটতে চলেছে এত দিনে। এই তো?

—আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হতে পারে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে না।

—কিন্তু এত দিনে কেন?

—খুঁজে বের করতে হবে। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন। —এটাই স্টার্টিং পয়েন্ট, মিঃ ত্রিবেদী।

ত্রিবেদী উত্তেজিত ভাবে বললেন—আমি কিন্তু দীনগোপালবাবুকে সোজাসুজি চার্জ করার পক্ষপাতী।

—উনি অস্বীকার করবেন।

—নীতা দেবী সাক্ষী। উনি আপনাকে বলেছেন।

কর্নেল হাসলেন। দীনগোপালবাবু অস্বীকার করলে শুধু মুখের সাক্ষ্যে কিছু হবে না, মিঃ ত্রিবেদী—অন্তত যতক্ষণ না সোনার মূর্তিটা ওঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার করতে পারছেন।

—ওক্কে! ওঁর বাড়ি তন্নতন্ন সার্চ করব।

—দীনগোপালবাবুকে তত নির্বোধ বলে মনে হয়নি আমার। একটু ধৈর্য ধরা দরকার মিঃ ত্রিবেদী। কর্নেল নিভন্ত চুরুট জ্বেলে ফের বললেন তার আগে একটা জরুরি কাজ করতে হবে। আশা করি, আপনার সাহায্য পাব।

—বলুন।

—সম্প্রতি, মানে গত কয়েকদিনের মধ্যে সরডিহির বাজারে

কোনও দোকান থেকে ডোরাকাটা মাফলার বিক্রী হয়েছে কি না ··

বাধা দিয়ে ত্রিবেদী বললেন—অসম্ভব। খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার ব্যাপার। অসংখ্য দোকান আছে। অসংখ্য মাফলার বিক্রি হয়েছে সিজনের মুখে।

—হলুদ রঙের ওপর কালো ডোরা। এই বিশেষত্বের জন্য দোকানদারদের মনে পড়া স্বাভাবিক।

ত্রিবেদী ভুরু কুঁচকে বললেন—আপনি শান্তবাবুর গলায় আটকানো মাফলারটার কথাই বলছেন তো?

—হ্যাঁ, মিঃ ত্রিবেদী।

—বেশ তা! ওটা নিয়ে দোকানে দোকানে খুঁজলেই হলো!

—না মিঃ ত্রিবেদী। তাতে দোকানদাররা ভয় পেয়ে যাবে। বিশেষ করে পুলিশকে দেখেই।

ত্রিবেদী একটু ভেবে বললেন—ঠিক বলেছেন। সাদা পোশাকেই কেউ খোঁজ নেবে। সে ব্যবস্থা এখনই করছি গিয়ে।

—কিন্তু হাতে ওই মাফলার নিয়ে নয়।

ত্রিবেদী হাসলেন।—না, না কখনই নয়। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, এতে লাভটা কি হবে? ধরা যাক, এমন একটা মাফলার মাত্র একজনেরই দোকানে ছিল এবং একজনই কিনেছে। কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হবে সেটাই শান্তবাবুর গলায় আটকানো হয়েছিল? এ যেন অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া!

কর্নেল আস্তে বললেন—ঠিক। কিন্তু ছুঁড়ে দেখতেই বা ক্ষতি কি, যদি লক্ষ্যভেদ করা যায়?

—ওকে ওল্ড বস! গণেশ ত্রিবেদী এবার একটু গম্ভীর হলেন—এস ডি পি ও সায়েবের সঙ্গে ফোনে আলোচনা করে আসছি। উনি বলছিলেন শান্তবাবুর মার্ডার কেসটা সি আই ডি-র হাতে ছেড়ে দিতে। কারণ শান্তবাবুর সঙ্গে একসময় এলাকার একটা গুপ্ত বিপ্লবী দলের যোগাযোগ ছিল। আই বি-র ফাইল দেখে উনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। দলটা ডাকাতি করে বেড়াত একসময়। ডাকাতি করা

টাকায় চোরা অস্ত্র-শস্ত্র কেনার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু পুলিশ দলটা খতম করে দিয়েছে। শুধু শান্তবাবু গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন পরে কলকাতায় কোনো রাজনৈতিক মুরুব্বি ধরে সেট্‌ল্‌ করে ফেলেন। সরডহি থানায় নির্দেশ আসে, ডোণ্ট বদার অ্যাবাউট হিম। এখন কথা হলো, সি আই ডি-র হাতে কেসটা যাক—অন্তত আপনাকে এখানে দেখার পর আমার এতে প্রচণ্ড আপত্তি। এস ডি পি ও সায়েবকে আপনার কথা তখনই বললাম। উনি আপনার কথা জানেন। তবে মুখোমুখি আলাপ হয়নি বললেন।

—কী নাম বলুন তো ?

—রণবীর রায়। বাঙালি। তবে এই বিহারেই জন্ম। পাটনায় ওঁদের বাড়ি।

—হুঁ কী বললেন রণবীরবাবু ?

ত্রিবেদী একটু হাসলেন। —আর কী বলবেন, ঠিক আছে। তাহলে যা ভাল বোঝেন, করুন। আমি যা ভাল বুঝেছি, করতে চাইছি, কর্নেল !

—বলুন।

—আমি নিজের হাতে নিয়েছি কেসটা। ও বাড়ির প্রত্যেককে আলাদাভাবে ডেকে জেরা করব ? স্টেটমেন্ট সই করিয়ে নেব। আপনিও উপস্থিত থাকবেন এবং আমার ইচ্ছা, আপনিও জেরা করবেন।

কর্নেল একটু ভেবে বললেন—বেশ তো ! শুধু একটা শর্ত।

—শর্ত ? কী শর্ত বলুন তো ?

—দীনগোপালবাবুকে সেই সোনার ঠাকুর সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করবেন না ! আমিও করব না। অবশ্য নীতাকে ও ব্যাপারে জেরা করতে পারেন।

আর কাউকে ?

—করতে পারেন। সে আপনার ইচ্ছা। তবে সাবধান ! দীনগোপালবাবুর সঙ্গে সোনার ঠাকুরের সম্পর্কের কথা এড়িয়ে থাকাই উচিত হবে। বরং সোজাসুজি প্রশ্ন করতে পারেন, কেউ কোনও সোনার ঠাকুর দেখেছেন কি না ?

ত্রিবেদী ঘড়ি দেখে বললেন—তিনটে বাজে। শান্তর বডি দাহ করতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। আমার ইচ্ছা, বরং আগামীকাল সকালে—ধরুন, নটা নাগাদ দীনগোপালবাবুর বাড়িতেই সরেজমিন তদন্ত শুরু করবো। আপনি ওই সময় ওখানে পৌঁছবেন। বাই দা বাই, যে ঘরে শান্তবাবু খুন হয়েছেন, সেই ঘরটা মিঃ পাণ্ডে গিয়ে লক করেছেন এবং দুজন কনস্টেবল পাহারা দিচ্ছে। নিচেও কয়েকজন কনস্টেবল রাখা হয়েছে। কোনও রিস্ক নিতে চাইনে আমি।

বলে গণেশ ত্রিবেদী উঠে দাঁড়ালেন। কর্নেল তাঁকে এগিয়ে দেবার জন্য উঠলেন। ত্রিবেদী জিপে স্টার্ট দিলে হঠাৎ বললেন আচ্ছা মিঃ ত্রিবেদী, সরডিহিতে কালো অ্যালসেশিয়ান কুকুর নিয়ে কাউকে ঘুরতে দেখেছেন কখনও?

ত্রিবেদী স্টার্ট বন্ধ করে অবাক হয়ে বললেন—কেন বলুন তো?

—আমি একজনকে কালো অ্যালসেশিয়ান নিয়ে ঘুরতে দেখেছি মাঠে।

ত্রিবেদী ফের স্টার্ট দিয়ে জোরে মাথা নাড়লেন।—নাঃ! আমি আড়াই বছর সরডিহিতে আছি। এ পর্যন্ত তেমন কাউকে দেখিনি। কুকুর অবশ্য অনেকেই পোষেন। তবে কালো অ্যালসেশিয়ান? নাঃ—দেখিনি।

—তাহলে বাইরের লোক। বেড়াতে এসেছে কুকুর নিয়ে।

ত্রিবেদী অট্টহাসি হাসলেন।—এ কেসের সঙ্গে লিংক থাকলে বলুন, তাকে খুঁজে বের করি।

কর্নেল হাত তুলে বললেন—না, না। কালো কুকুর আমার চক্ষুশূল। তাই এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম। কালো নাকি অশুভের প্রতীক। আমার কিছু কিছু কুসংস্কার আছে আর কী!

ত্রিবেদীর জিপ জোরে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে রামলাল বাংলোর পেছন থেকে এসে গেট বন্ধ করল।

কর্নেল বললেন—রামলাল, আমি বেরুচ্ছি। ফিরতে দেরি হলে রাতের খাবারটা আমার ঘরের টেবিলে রেখে দিও।

রামলাল মাথা দোলাল। এই খেয়ালী বুড়ো কর্নেল সায়েবকে সে গত বছরই ভালভাবে চিনে ফেলেছে। তবে এটা ঠিকই যে, সে কথামতো রাতের খাবার টেবিলে রেখে গিয়ে শুয়ে পড়বে না। যতক্ষণ না কর্নেল সায়েব ফেরেন, সে জেগে থাকবে এবং গরম খাবারই পরিবেশন করবে।

সকালে যে উঁচু ঢিবির মতো জমিতে লাল ঘুঘুর ঝাঁক দেখেছিলেন কর্নেল, সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পড়ন্ত সূর্য প্রায় সামনা সামনি, তাই বাইনোকুলার ব্যবহার করার সমস্যা। নিচু জমিতে, যেখানে ছাইরঙা মাফলার পড়ে থাকতে দেখেছিলেন সকালে, সেখানে পৌঁছুতেই কোথাও চাপা গর্জন শুনতে পেলেন। কুকুরেরই গরগর গর্জন। থমকে দাঁড়ালেন। উঁচু ঝোপঝাড়ে ভরা ঢিবি জমি থেকে কালো কুকুরটা তাঁর দিকে তেড়ে আসছে।

ঝটপট জ্যাকেটের পকেট থেকে নিজের আবিষ্কৃত প্রখ্যাত 'ফর্মূলা-টোয়েন্টির' কৌটোটি বের করলেন। প্রজাপতি ধরা জালের স্টিকের মাথায় কৌটোটা আটকানোর ব্যবস্থা আছে। কৌটো আটকে ছিপি খুলে স্টিকটা উঁচিয়ে ধরলেন কর্নেল।

কুকুরটা আসছিল দক্ষিণ থেকে। বাতাস বইছে উত্তর থেকে। ঝোপের কাছে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। প্রকাণ্ড কুকুর। কুচকুচে কালো রঙ। লকলকে জিভ। গলার ভেতর বাঘের গজরানি যেন।

কর্নেল স্টিক উঁচিয়ে দু তিন পা এগোতেই কুকুটা কুঁই কুঁই শব্দ করে ঘুরল। তারপর লেজ গুটিয়ে নিমেষে অদৃশ্য হলো।

কর্নেল আপন মনে হাসলেন। কুকুর জব্দ-করা এই বিদঘুটে গন্ধের লোশন আরও পাঁচটা টুকিটাকি জিনিসের মতোই তাঁর সঙ্গে থাকে, যখনই বাইরে কোথাও যান। কিন্তু সরডিহিতে এটা এত কাজে লাগবে, কল্পনাও করেননি।

কৌটোটা জ্যাকেটের ভেতর পকেটে চালান করে এবার দ্রুত মাফলারটা পড়ে আছে কি না খুঁজে নিলেন। নেই। কেউ কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। আর, সেটাই স্বাভাবিক।

পরমুহূর্তে একটা অনুভূতি তাঁকে চমকে দিল—ষষ্ঠেন্দ্রিয় জাত বোধ, যেন কেউ উঁচুতে ঝোপের ভেতর দিকে তাঁকে লক্ষ্য করছে, এবং এক সেকেণ্ডেরও হয়তো কম সময়ের জন্য কী একটা শব্দ শুনেছেন, এক লাফে বাঁদিকের একটা পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে গিয়ে বসে পড়লেন—ঠিক বসে পড়া নয়, আছাড় খাওয়ার মতো পড়া। লম্বা চাওড়া মানুষের এরকম ঝাঁপ দেওয়ায় মাটিতে ধপাস শব্দটা বেশ জোরালোই হলো।

সেই মুহূর্তে অদ্ভুত একটা ঘ্যাস শব্দ হলো ডানদিকে, এখনই যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘুরেই দেখলেন, নরম মাটিতে ঘাসের ভেতর একটা ভোজালি গড়নের ভারি ছোরার বাঁট কাত হয়ে আছে। কেউ প্রচণ্ড জোরে ওটা তাঁকে তাক করে ছুঁড়েছে। দেখা মাত্র জ্যাকেটের ভেতর থেকে রিভলবার বের করে ওপরের ঝোপের দিকে আন্দাজে গুলি ছুড়লেন। স্তব্ধতা চিড় খেল। লাল ঘুঘুর ঝাঁকটা কোথাও ছিল। ডানার শব্দ করে উড়ে গেল। কর্নেল নির্ভয়ে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে রিভলবার উচিয়ে রেখে বাঁ হাতে গলায় ঝুলানো বাইনোকুলার চোখে রাখলেন। যে ছোরা ছুঁড়েছে, তার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র কখনই নেই।

কিন্তু ঝোপের লতাপাতা লেন্সে ঢেকে যাচ্ছে। সাহস করে এগিয়ে গেলেন। উঁচু ঢিবি জমিতে উঠে চারদিকে লোকটাকে খুঁজলেন। যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

নেমে এসে ছোরাটা তুললেন। প্রায় আট ইঞ্চি লম্বা চকচকে ফলাটা নরম মাটিতে আমূল বিঁধে গিয়েছিল। শিউরে উঠলেন কর্নেল। একটু হঠকরিতা হয়ে গেছে তাঁর দিক থেকে। আগে ভালভাবে চারদিক দেখে না নিয়ে নিচু জমিতে এসে দাঁড়ানো ঠিক হয়নি। সাক্ষাৎ মৃত্যু থেকে এক চুলের জন্য বেঁচে গেছেন। সামরিক জীবনে জঙ্গলে জঙ্গলে গেরিলা যুদ্ধের তালিম নেওয়ার সময় এ ধরনের হামলার জন্য প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকার বোধটা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। সেটা কখনও কখনও কাজে লাগে। কোন শব্দ বা আড়ালে কোন

উপস্থিতি বিপজ্জনক, নিমেষে টের পান। আবার সেই বোধ আজ কাজে লাগল। কিন্তু এই অতর্কিত উত্তেজনার জন্য যতটা নয়, ছোরাটা তাঁকে ফুঁড়ে ফেলত ভেবেই শরীর ক্লান্ত মনে হচ্ছিল।

কর্নেল পেছনকার খোলামেলা ন্যাড়া উঁচু জমিতে উঠে একটা পাথরে বসে পড়লেন। রিভলবারটা জ্যাকেটের ভেতর ঢুকিয়ে বাঁ হাতে ধরা ছোরাটার দিকে তাকালেন। মাঠে শেষ বিকেলে উত্তরের বাতাস যথেষ্ট হিম। কিন্তু তাঁর শরীরে অস্বাভাবিক একটা উষ্ণতা। হাত কাঁপছে। মৃত্যুর বিভীষিকা তাঁকে দুর্বল করে না। নির্বুদ্ধিতা-জনিত ঝুঁকি নিয়েছিলেন ভেবেই এই আড়ষ্টতা আর কম্পন।

ভাবছিলেন, কেন এমন একটা ঝুঁকি নিতে এসেছিলেন - জেনে-শুনেও! বার্ধক্যজনিত বুদ্ধিভ্রংশ কি অবশেষে তাঁকে পেয়ে বসেছে এবং এই ঘটনা তারই সংকেত? কাঁপা-কাঁপা হাতে ছোরাটা পাশে রেখে চুরুট ধরালেন কর্নেল। একটু পরে ধাতস্থ হলেন। কিন্তু শরীর অবশ মনে হচ্ছিল।

সূর্য পশ্চিমের পাহাড়ের নিচে নেমে গেল ক্রমশ। ধূসর আলো ঘনিয়ে এল। অন্যমনস্কতায় অথবা স্বাভববশে বাইনোকুলারে নিচু টিলাটা দেখতে গিয়েই চমকে উঠলেন। পিপুল গাছের তলায় কালো কুকুর আর সেই লোকটা—তাঁর ব্যর্থ আততায়ী দাঁড়িয়ে আছে। দূরত্ব প্রায় সিকি কিলোমিটার। তাঁকে দেখছে লোকটা! আবছা হয়ে আসছে তার মুখ। কুকুরটা পেছনকার ঠ্যাং মুড়ে বসে আ‌ছে। ক্রমশ গাছের তলার কালো পাথরটার সঙ্গে কুকুরটাও একাকার হয়ে গেল।...

—কে ওখানে?

দীনগোপাল গেটের কাছে ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাড়ির বারান্দার মাথায় যে বাল্‌বটা জ্বলছে, তার আলো গেট অব্দি পৌঁছোতে ফিকে হয়ে অন্ধকারে মিশে গেছে। গলার স্বরে আজ তীব্র চমক ছিল। কর্নেল সাড়া দিয়ে বললেন—আমি দীনগোপালবাবু! কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

—ডিটেকটিভ মশাই! দীনগোপাল আস্তে বললেন। তবু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের আভাস কথাটাতে।—তা আমার কাছে কী? আপনার মক্কেল এখন নেই। শ্মশানে যান, দেখা হবে।

লনের শেষে বাড়ির সামনেকার বারান্দায় একটা বেঞ্চে একদঙ্গল কনস্টেবল বসে আছে দেখা যাচ্ছিল। কর্নেল গেটের কাছে গিয়ে বললেন আপনি কি এখানে কারুর জন্য অপেক্ষা করেছেন দীনগোপালবাবু?

দীনগোপাল রুক্ষ মেজাজে বললেন—আমার জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে আছি। কারুর অপেক্ষা করছি কি না এ প্রশ্ন অর্থহীন।

—আপনি শ্মশানে যাননি দেখে একটু অবাক লাগছে দীনগোপালবাবু!

—অবাক হবার অধিকার আপনার আছে। কিন্তু আমাকে উত্ত্যক্ত করার অধিকার আপনার নেই।

কর্নেল একটু হাসলেন।—উত্ত্যক্ত করতে আমি আসি নি দীনগোপালবাবু। আমি আপনার হিতৈষী।

—আমার কোন হিতৈষীর দরকার নেই।

—নেই! তার কারণ আপনি ভালই জানেন যে, আপনার প্রাণের ক্ষতি কেউ করবে না।

দীনগোপাল এক পা এগিয়ে বললেন—তার মানে?

—তার মানে, আপনাকে মেরে ফেললে কারুর কোনও লাভ তো হবেই না, ভীষণ ক্ষতি হবে।

—এ হেঁয়ালির অর্থ বুঝলাম না।

—সোনার ঠাকুর ফিরে পাওয়ার আর সম্ভাবনাই থাকবে না।

দীনগোপাল কয়েক মুহূর্তের জন্য পাষাণমূর্তি হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর গলা ঝেড়ে আস্তে বললেন—সোনার ঠাকুর? কী অদ্ভুত কথা!

—দীনগোপালবাবু! আপনি এবার বুঝতে পেরেছেন কি শান্তকে কেন মরতে হল?

দীনগোপালবাবু আবার পাষাণমূর্তি হয়ে গেলেন।

কর্নেল বললেন—আমি অন্তর্যামী নই। নিছক অঙ্ক কষে তুইয়ে তুইয়ে চার করেছি মাত্র। সরডিহির রাজবাড়ির সোনার ঠাকুর তারই গুপ্ত বিপ্লবী দল চুরি করেছিল, এটা স্পষ্ট। শান্ত সেটা আপনার বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিল। দৈবাৎ আপনি সেটা দেখতে পান। শান্তকে বাঁচানোর জন্যই আপনি সেটা লুকিয়ে ফেলেন। শান্ত খুঁজে না পেয়ে দলের কাছে কৈফিয়তের ভয়ে পালিয়ে যায়। সম্ভবত তারপরই নীতা তার স্বামীকে নিয়ে হনিমুনে আসে এখানে। এদিকে আপনি ঠিক করতে পারছিলেন না, মূর্তিটা কী করবেন। ফেরত দিতে গেলে ঝুঁকি ছিল। আপনাকে মিথ্যা কথা বলতে হতো। দীনগোপালবাবু, আপনি এমন মানুষ, যিনি সত্য গোপন করার চাইতে মিথ্যা বলাটাই অন্যায় মনে করেন। অতএব আপনি সত্যকে গোপন রেখে আসছেন এতদিন। কিন্তু আপনার এই নীতিবোধের ফলেই শান্তকে ফাঁদে পড়ে প্রাণ দিতে হলো।

দীনগোপাল হঠাৎ ঘুরে হনহন করে চলে গেলেন বাড়ির দিকে।

কর্নেল একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর রাস্তায় নেমে এলেন। সেচ বাংলোর দিকে এগিয়ে চললেন। কিছুটা চলার পর পুরসভা এলাকায় রাস্তার ধারে ল্যাম্পপোস্ট থেকে আলো পড়েছে রাস্তায়। রাস্তাটা ডাইনে ঘুরে সরডিহি বাজার ও বসতির ভেতর ঢুকে গেছে। বাঁদিকে সংকীর্ণ ঢালু রাস্তাটা গেছে সেচ বাংলোর দিকে। এ রাস্তার আলো নেই। তুধারে ঘন গাছপালা। প্যাণ্টের এক পকেটে রুমালে জড়ানো ছোরাটার অস্তিত্ব অনুভব করলেন কর্নেল। সহসা তীব্রভাবে একটা গা শিরশির করা বিভীষিকা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য তাঁকে নাড়া দিল। অন্য পকেট থেকে দ্রুত টর্চ বের করে জ্বাললেন।

তুধারে আলো ফেলতে ফেলতে হাঁটছিলেন কর্নেল। এমন কি রিভলবারটাও বের করে তৈরি রেখেছেন, মৃত্যুর বিভীষিকা পিছু ছাড়ছে না যেন।

রামলালকে বারান্দার আলোয় দেখা গেল চড়াইয়ে ওঠার মুখে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। গায়ে চাদর জড়ানো। আজ শীতটা একটু জোরালো হয়েছে। এখানে এভাবেই হঠাৎ শীত রাতারাতি বেড়ে যায়।

গেটে পৌঁছুলে সে উঠে দাঁড়াল। সেলাম দিয়ে এগিয়ে এল। বলল কলকাত্তাসে এক বাঙ্গালি সাহাব লোক আয়া স্যার। তিসরি নাম্বারামে উনহিকা আগাড়ি বুকিং থা। মালুম, ডি ই সাহাবকা কৈ জানপহচান আদমি। পুছতা. এক নাম্বারমে কৌন আয়া? হাম বোলা, কর্নেলসাহাব।

কর্নেল দেখলেন পশ্চিমের তিন নম্বরের দরজা বন্ধ। পুবে জালা-ধারের দিকটায় এক নম্বর। কর্নেল তালা খুলে ঘরে ঢুকলেন! দরজা থেকে রামলাল মৃদু হেসে বলল—কফিউফি পিনা জরুরি হ্যায় স্যার। আজ বহৎ ঠাণ্ডা মালুম হোতা!

হাঁ রামলাল। কফি! বলে কর্নেল দরজা ভেজিয়ে দিলেন এবং পকেট থেকে রুমালে জড়ানো ছোরাটা বের করে বালিশের তলায় রেখে দিলেন। ইজিচেয়ারে বসে সাদা দাড়ি খামচে ধরে চোখ বুজলেন অভ্যাসমতো।

একটু পরে দরজায় টোকা দিয়ে রামলাল সাড়া দিল - কফি স্যার।

—আও রামলাল। বলে কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন।

রামলাল পাশের টেবিলে কফির পেয়ালা রেখে বেরিয়ে যাবার সময় দরজা আগের মতো ভেজিয়ে দিচ্ছিল। কর্নেল বললেন—খোলা থাক। রহ্‌নে দো!

রামলাল চলে যাওয়ার মিনিট দুই পরে খোলা দরজার সামনে একজন স্মার্ট চেহারার যুবক এসে দাঁড়াল। পরনে ঘিয়ে রঙের জ্যাকেট আর জিনস? একটু হেসে নমস্কার করে বলল—আসতে পারি?

কর্নেল এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বললেন—আসুন!

যুবকটি ঘরে ঢুকে একটু তফাতে একটা চেয়ারে বসে বলল—আপনিই কি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। আমার সৌভাগ্য, আপনার সঙ্গে এখানে মুখোমুখি পরিচয় হবে কল্পনাও করিনি। চৌকিদারের

কাছে বর্ণনা শুনেই চিনতে দেরি হয়নি, আপনি তিনিই।

—আপনি আমাকে চেনেন?

—জামাইবাবু, মানে আমার দিদি কেয়ার স্বামী অমর চৌধুরী লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টারে ডিটেকটিভ ডিপার্টের ইন্সপেক্টর। তাঁর কাছে আপনার সাংঘাতিক সব গল্প শুনেছি।

কর্নেল একটু হেসে বললেন তাহলে অমরবাবুর শ্যালক আপনি?

—আমার নাম প্রসূন মজুমদার।

কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন।—আশা করি দীনগোপালবাবুর ভাইঝি শ্রীমতী নীতার···

প্রসূন এক নিঃশ্বাসে এবং কাঁচুমাচু হেসে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—ঠিক ধরেছেন। আমিই সেই হতভাগা।

বলার ভঙ্গিতে কর্নেল হেসে ফেললেন। পরক্ষণে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—নীতার সঙ্গে তো আপনার ডিভোর্স হয়ে গেছে?

—পুরোপা হয়নি, আইনত। প্রসূনও একটু গম্ভীর হলো।—লিগাল সেপারেশনের পিরিয়ড চলছে।

—আপনার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তুলেছি বলে এ বৃদ্ধকে ক্ষমা করবেন। তবে প্রশ্নটা জরুরি ছিল।

—প্লিজ কর্নেল আমাকে তুমি বলুন।

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বললেন—হুঁ। তুমি অমরবাবুর শ্যালক। স্বচ্ছন্দে তুমি বলা চলে।

—এবং ব্যক্তিগত প্রসঙ্গও তোলা যায়! প্রসূন শুকনো হাসল। ফের বলল—সেই সঙ্গে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে সামনে পেয়ে আশাও জাগে।

—পুনর্মিলনের?

প্রসূন আস্তে বলল—নীতা বড় অবুঝ মেয়ে? দোষের মধ্যে আমি একটু-আধটু ড্রিংক করি। বেহিসেবি খরচ করে ফেলি। কিন্তু ও আমাকে ভুল বুঝেছিল। অকারণ আমাকে সন্দেহ করত, আমার চরিত্র নাকি ভাল নয়। একেবারে মিথ্যা।

--হুঁ ! তো তুমি কি নীতার সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই এখানে এসেছ ?

--তাই। শেষ চেষ্টা বলতে পারেন। লিগাল সেপারেশন পিরিয়ড শেষ হতে আর এক মাস বাকি।

—তুমি কিভাবে জানলে নীতা সরডিহিতে এসেছে ?

—আমার দিদি কেয়ার সঙ্গে নীতার খানিকটা বন্ধুত্ব আছে। বয়সের তফাত মেয়েদের মধ্যে বন্ধুতার বাধা নয়, আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন।

—তোমার দিদি তোমাকে বলেছে নীতা সরডিহি গেছে ?

—কথা প্রসঙ্গে বলে ফেলেছিল। মানে, জামাইবাবুর সঙ্গে নীতাদের ব্যাপারে কী আলোচনা করছিল। তখন…

—কেন গেছে বলেনি তোমার দিদি ?

প্রসূন একটু অবাক চোখে তাকিয়ে বলল—না তো! তাছাড়া নীতা তো মাঝে মাঝে আসে এখানে।

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন—তুমি শান্তকে নিশ্চয় চেনো ?

চিনি। উগ্রপন্থী রাজনীতি করে। জামাইবাবু ওকে বহুবার বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

—তুমি জানো গত রাতে ওর জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে শান্ত খুন হয়েছে ?

প্রসূন ভীষণ চমকে উঠল।—শান্ত খুন হয়েছে ? শান্ত…সর্বনাশ !

বলেই সে চেয়ার থেকে উঠে পড়ল এবং ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কর্নেল তাকিয়ে রইলেন শুধু। একটু পরে বাইরে গিয়ে দেখলেন, তিন নম্বর ঘরের দরজায় তালা আঁটা।…

## ॥ পাঁচ ॥

কর্নেল রাত প্রায় বারোটা অব্দি জেগে ছিলেন। প্রসূনের ফেরার অপেক্ষা করছিলেন। হঠাৎ অমন করে তার চলে যাওয়ায় অবাক

হয়েছিলেন। ফলে প্রসূনের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রহস্যটার একটা ক্ষীণ সূত্র যে আছে, বুঝতে পেরেছিলেন। রামলাল তিন নম্বরের বাঙালি সায়েবের জন্য এগারোটা অব্দি অপেক্ষা করে শুয়ে পড়েছিল। বলেছিল—আজিব আদমি! হাম ক্যা করে বোলিয়ে স্যার? সুবেমে নেহি লোটে তো থানেমে খবর কিয়েগা। কর্নেল শুধু বলেছিলেন—ঠিক হ্যায়, রামলাল।

এই বাংলোয় টেলিফোন একটা আছে। কিন্তু কিছুদিন থেকে ডেড। রামলাল এক্সচেঞ্জে খবর দিয়েছে। এখনও কেউ সারাতে আসেনি। সরডিহিতে নাকি সবই এরকম ঢিমেতেতালা চালে চলে। রামলালের মতে, খোদ ডি ই সাহেব এসে পড়লে ফোনটা চালু হবার সম্ভাবনা আছে। নৈলে ডেড থেকেই যাবে।

অভ্যাসমতো ভোর ছটায় কর্নেল প্রাতঃভ্রমণে বেরুলেন। বাইরে গাঢ় কুয়াশা। আজ ঠাণ্ডাটাও জোরালো। গায়ে ওভারকোট চড়িয়ে হনুমান টুপি পরে বেরুতে হলো। প্রজাপতির নাগাল পাওয়া এ আবহাওয়ায় অসম্ভব। তাই প্রজাপতি ধরা জালটি সঙ্গে নেননি। তবে বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা নিয়েছিলেন। রিভলবারও। কাল থেকে অতর্কিত মৃত্যু-বিভীষিকাটি মনে যখন তখন গভীর জলের মাছের মতো ঘাই মারছে।

দীনগোপালের বাড়ির নিচের রাস্তা দিয়ে পশ্চিমে টিলা পাহাড়গুলোর দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন কর্নেল। ছোট্ট সোঁতার ওপর ব্রিজে পৌঁছে দক্ষিণ-পশ্চিমে সেই পিপুল গাছ-শীর্ষক টিলাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। কুয়াশায় সব একাকার।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর টিলাটির দিকে এগিয়ে চললেন। পিপুল গাছের তলার প্রায় চৌকো বেদীর গড়ন কালো পাথরটিকে গতকাল সকালে লক্ষ্য করেছেন। গতকাল দিনশেষে তারই ওপর বসে থাকতে দেখেছেন নিজের আততায়ীকে, যার একটা কালো অ্যালসেশিয়ান আছে।

পাথরটি কেন যেন তাঁর মনোযোগ দাবি করছে। সেটির গড়নে

কোনও অস্বাভাবিকতা আছে কি? পরীক্ষা করার তাগিদেই এখন খুব সতর্কতার সঙ্গে চারদিক দেখতে দেখতে টিলায় উঠছিলেন কর্নেল। কুয়াশার সঙ্গে স্তব্ধতাও এই পারিপার্শ্বিককে নিঝুম করে রেখেছে। তবে এমন স্তব্ধতা তাঁর জন্য এখন নিরাপদ।

পিপুলতলায় পৌঁছে চোখে পড়ল, বেদীর পেছনে একরাশ ছাই। কেউ আগুন জ্বেলে তাপ নিয়েছে—সম্ভবত গতকাল সন্ধ্যার দিকেই। কারণ, কিনারায় মাকড়সার জাল এবং তাতে শিশিরের ফোঁটা জমেছে। সেই আততায়ী ছাড়া আর কে হতে পারে? অবশ্য সর্বক্ষেত্রে দুয়ে দুয়ে চার হয় না।

টিলার ওপাশটা কিছুটা খাড়া। ন্যাড়া পাথর উঁচিয়ে আছে। ডাইনে বাঁয়ে ঢালুতে ইতস্তত কয়েকটি ঝোপ। দেখে নেওয়ার পর চৌকো পাথরটার দিকে মনোযোগ দিলেন কর্নেল।

হুঁ পাথরটার গড়ন স্বাভাবিক নয়। তার মানে, কোনও সময়ে মানুষের হাত পড়েছিল এর গায়ে—এটা আসলে একটা বেদীই বটে। তাছাড়া যে আঁক-জোকগুলোকেও প্রাকৃতিক সৃষ্টি ভেবেছিলেন, সেগুলো মানুষেরই তৈরি। অজস্র স্বস্তিকা চিহ্ন খোদাই করা হয়েছিল একসময়। প্রকৃতির আঘাতে ক্ষয়ে গিয়ে বিশৃংখলা রেখায় পরিণত হয়েছে।

তাহলে বলা যায়, এটা কোনও পূজা-বেদী, অথবা কোনও দেব-দেবীর 'থান'। এলাকার আদিবাসী বা তথাকথিত নিম্নবর্ণীয় মানুষদের পুজো-আচ্চা হতো একসময়। যে কারণে হোক, পরিত্যক্ত হয়েছে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, গতকাল সকালে দীনগোপাল তাঁকে এখানে দেখে প্রায় তেড়ে এসেছিলেন! কেন? দীনগোপাল কি তাঁর উপস্থিতি অবাঞ্ছিত মনে করেছিলেন এখানে? কী আছে এখানে?

পাথরটা ঠাণ্ডা হিম। তবে কর্নেলের হাতে দস্তানা পরা আছে। ঠেলে নড়ানোর চেষ্টা করে বুঝলেন অসম্ভব। তারপর ফের ছাইগুলোর কাছে গেলেন।

হঠাৎ চোখে পড়ল, ছাইয়ের পাশে ইঞ্চিটাক এক টুকরো কাপড় জাতীয় জিনিস। সেটা দৈবাৎ পোড়েনি। হাতে নিয়েই কর্নেল বুঝতে পারলেন, এটা সেই ছাইরঙা মাফলারেরই অংশ। সম্ভবত কালো কুকুরের মালিক এখানে বসে মাফলারটা নিশ্চিহ্ন করেছে। 'সম্ভবত' এই কথাটিই মাথায় আসছে। কারণ কে এ কাজ করেছে, কর্নেল বস্তুত দ্যাখেননি ধরা যাক, সে-ই খুনী। কিন্তু একটা খটকা থেকে যাচ্ছে: মর্গের পরীক্ষায় খুন যখন সাব্যস্ত হতোই, তখন শান্তর মাফলার নিয়ে খুনীর এত মাথাব্যথা কিসের? সে কি এত নির্বোধ যে, ভেবেছিল পোস্টমর্টেম ছাড়াই শান্তর লাশ দাহ করা হবে? দেয়ালের ব্র্যাকেট থেকে শান্তর মাফলারটা এক ঝটকায় টেনে নিয়ে যাওয়া এবং মাঠে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়ার মধ্যে আপাতদৃষ্টে মনে হয়, শান্তর আত্মহত্যাই সে সাব্যস্ত করাতে চেয়েছিল। কিন্তু পোস্টমর্টেমের কথা অবশ্যই ভাবা উচিত ছিল তার। যে কোনও অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় অন্তত সরডিহির মতো জায়গায় পুলিশকে না জানিয়ে দাহ করার ঝুঁকি আছে। সে ঝুঁকি দীনগোপালবাবু বা তাঁর ভাইপো-ভাইঝিরা নেবে কেন? তাছাড়া অমন হুঁশিয়ার মানুষ প্রভাতরঞ্জন সেখানে উপস্থিত!

বিশেষ করে নীতা কর্নেলকে এখানে ডেকে এনেছে। অন্যেরা যদি বা পারিবারিক কেলেঙ্কারি ঢাকতে, ধরা যাক, পুলিশকে না জানিয়ে দাহ করে ফেলতেন নীতা চুপ করে থাকত না।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দুটো পয়েন্ট কর্নেলের মাথায় ভেসে এল।

এক: শান্তর 'আত্মহত্যা'র খবর পুলিশকে প্রথম কে জানিয়েছিল, জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছেন।

দুই: শান্তর মাফলার নিয়ে আসা কি শান্তর আত্মহত্যা আপাতদৃষ্টে সাব্যস্ত করা, নাকি অন্য কোনও গূঢ় কারণ ছিল—যখন শান্তর লাশের পোস্টমর্টেমের চান্স প্রায় ৯৯ শতাংশ?

পূবে সরডিহির মাথায় কুয়াশার ভেতর আবছা লালচে গোলা—সূর্য উঠে গেছে। লালচে রঙটা দ্রুত সোনালী হয়ে যাচ্ছে। আশে-

পাশে কুয়াশা অনেক পাতলা হয়েছে। কর্নেল চুরুট জ্বাললেন। কিন্তু কাশি পেল। খালি পেটে চুরুট টানেন না কখনও। আসলে কেসের ওই পয়েন্ট দুটো তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল এবং তারপর মনে পড়ে গিয়েছিল প্রসূনের অন্তর্ধানের কথাটি। কোনও বিপদ ঘটেনি তো তার! শান্তর খুনের খবর শুনেই অমন উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে নিপাত্তা রইল সে। কর্নেল বেদীতে ঘষে চুরুটটি নিভিয়ে ফেললেন।

কিছুক্ষণ পরে হলদেটে রোদ ফুটলে বাইনোকুলারে লাল ঘুঘুর ঝাঁক খুঁজতে থাকলেন। সেই উঁচু ডাঙা জমিটার ওপর থেকে বাইনোকুলার বাঁ দিকে ঘোরাতেই রাস্তার উত্তরে সমান্তরালে ক্যানেলের পাড়ে দুটি মূর্তি আবছা ভেসে উঠল। এদিকে পেছন-ফেরা দুটি মানুষ। একজন পুরুষ, অন্যজন মেয়ে।

চমকে উঠেছিলেন কর্নেল। ঠোঁটে হাসিও ফুটেছিল। কিন্তু তারা এদিকে ঘুরে একটা টাঁড় জমির ওপর দিয়ে রাস্তার দিকে আসতে থাকল, তখন নিরাশ হলেন। প্রসূন ও নীতা নয়, দীনগোপালের আরেক ভাইপো অরুণ আর তার স্ত্রী ঝুমা।

অরুণ খুব হাত নেড়ে স্ত্রীকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে। ঝুমা যেন বুঝতে চাইছে না, এরকম হাবভাব। কর্নেল বাইনোকুলার নামালেন চোখ থেকে। কোনও দম্পতিকে এভাবে দূর থেকে লক্ষ্য করাটা অশালীন বিশেষ করে যখন ওরা টিলার মাথায় কর্নেলকে দেখতে পাবে, কী ভাববে?

ওরা রাস্তা ধরে পশ্চিমে এগিয়ে আসছে। ব্রিজের ওপর এসে গেলে কর্নেল টিলা থেকে নিম্নগামী হলেন। সোঁতার পাড় ধরে রাস্তার কাছে পৌঁছে একটু কাশলেন। অমনি অরুণ ভীষণ চমকে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। তাঁর দিকে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কেমন চোখে তাকিয়ে রইল। কর্নেল বুঝলেন, তাঁকে ওরা চিনতে পারছে না। পারবার কথাও নয়। ওভারকোট, তার ওপর হনুমান টুপিতে সাদা দাড়ি পুরোটাই ঢাকা।

কিন্তু কাছাকাছি গেলে ঝুমা একটু হেসে ফেলল। কর্নেলও

সহাস্যে বললেন—গুড মর্নিং !

অরুণ তখনও চিনতে পারেনি। গোমড়া মুখে আস্তে বলল—মর্নিং !

ঝুমা বলল—ও আপনাকে চিনতে পারছে না। আবার, এতক্ষণ আমাকেই উল্টো বোঝাবার চেষ্টা করছিল আমি মানুষ চিনি না ! বুঝুন কর্নেলের কেমন অবজার্ভার আমার এই হাজব্যাণ্ড ভদ্রলোক !

সঙ্গে সঙ্গে অরুণ জিভ কেটে হাত বাড়িয়ে বলল—হ্যালো কর্নেল ! সরি—ভেরি সরি ! একেবারে চেনা যায় না এ বেশে ! বলে কর্নেল দস্তানা পরা হাতে হাত দিয়ে সে ঝাঁকুনি দিয়ে হৃদ্যতা প্রকাশ করল।

কর্নেল বললেন—ঝুমা দেবী, আশা করি এই বাইনোকুলারটি দেখেই চিনতে পেরেছেন এ বৃদ্ধকে ?

—হ্যাঁ। ঝুমা মাথা দোলাল। তবে নীতার মতো আমাকেও তুমি না বললে রাগ করব।

অরুণ বলল—আমাকেও।

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ। আমি সব মানুষের নৈকট্যপ্রার্থী।

—কী বললেন, কী বললেন ? অরুণ ছেলেমানুষী ভঙ্গি করে বলল—নৈকট্যপ্রার্থী ! দারুণ একটা কথা। মুখস্থ রাখার মতো। নৈ-ক-ট্য-প্রা-র্থী ! তারপর সে ঝুমার দিকে ঘুরল।—সরি ! ঝুমা, ইংরেজিতে এর সেন্সটা একটু ক্লিয়ার করে দেবে ?

ঝুমা চোখ পাকিয়ে বলল—তুমি ইংলিশম্যান নাকি ? বাঙালির ঘরে জন্ম—বাংলা বোঝো না !

অরুণ জোকারের ভঙ্গি করল।—ট্যাঁশ ! ট্যাঁশ হয়ে গেছি ক'বছর ওয়েস্টে থেকে। তবে এক মিনিট !···হুঁ, কথাটার মানে, হি লাইকস টু কাম নিয়ারার। ইজ ইট ?

ঝুমা ধমকের সুরে বলল—খুব হয়েছে। কর্নেল বুঝি মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলেন ?

কর্নেল একটু মাথা নেড়ে বললেন—একটা কথা। গত রাতে

আশা করি কোনও গণ্ডগোল হয়নি। পুলিশ পাহারা ছিল যখন, তখন কোনো ··

অরুণ কথা কেড়ে বলল—হয়েছে। সাংঘাতিক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল, নীতু ইজ লাকি—জোর বেঁচে গেছে। তবে পুলিশ টুলিশ বলছেন, বোগাস! মামাবাবু ভাগ্যিস ছিলেন, তাই নীতু বেঁচে গেল।

ঝুমা কী বলতে যাচ্ছিল, কর্নেল দ্রুত বললেন—প্রসূন?

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে চমকে কর্নেলের দিকে তাকাল। তারপর ঝুমা শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বলল—হ্যাঁ, নীতার বর। আপনি চেনেন ওকে?

—চিনি। কর্নেল বললেন—প্রসূন ও বাড়ি গিয়েছিল? তারপর?

অরুণ উত্তেজিতভাবে বলল—যাওয়া মানে কী? হামলা! মামাবাবুর চোখে পড়ে যায় সময়মতো। ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। মামাবাবুকে আপনি চেনেন না, কর্নেল!

ঝুমা বলল—আঃ! তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করো সবতাতে। কর্নেল, আমি বলছি কী হয়েছিল। প্রসূনের কী উদ্দেশ্য ছিল জানি না। তবে ও কাল রাত্তিতে ও-বাড়ি ঢুকেছিল। গেটে তালা বন্ধ ছিল। ও পেছনদিককার ভাঙা পাঁচিলের বেড়া দিয়ে ঢুকছিল। সেই সময় মামাবাবু দোতলা থেকে ওকে দেখতে পান। তারপর চুপিচুপি নেমে গিয়ে ওত পেতেছিলেন। প্রসূন ঢোকামাত্র মামাবাবু ওকে ধরে ফেলেন। সে এক হুলুস্থুল ব্যাপার।

কর্নেল গুম হয়ে বললেন তাহলে সে এখন থানার লক-আপে?

অরুণ বলল হ্যাঁ! এবার তো বোঝা গেল হু ইজ দা মার্ডারার।

—কীভাবে বোঝা গেল?

অরুণ রুষ্ট মুখে হাসবার চেষ্টা করল।—পিওর ম্যাথ, কর্নেল!

—বুঝলাম না।

ঝুমা, বুঝিয়ে দাও। আমার রাগ হলে কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

ঝুমা বলল—নীতুর সঙ্গে প্রসূনের বিয়ের পেছনে ছিল শান্ত।

শান্ত প্রসূনের বন্ধু ছিল। শান্ত পলিটিক্স করত শুনেছেন হয়তো ? আপনি ডিটেকটিভ। আপনি নিশ্চয় জানেন শান্ত কী ছিল!

অরুণ মন্তব্য করল—এক্সট্রিমিস্ট! বাংলায় কী যেন বলে, ঝুম ?

—উগ্রপন্থী। ঝুমা শ্বাস ছেড়ে বলল।—তো শান্ত মাঝে মাঝে নীতুর ফ্ল্যাটে গিয়ে লুকিয়ে থাকত। প্রসূনের সঙ্গে কী ব্যাপারে যোগাযোগও যেন ছিল। নীতা তো স্পষ্ট করে কিছু বলে না।

—প্রসূন ব্যাটাচ্ছেলেও পলিটিক্যাল এক্সট্রিমিস্ট! অরুণ ফের মন্তব্য করল।

ঝুমা বলল—যাই হোক, নীতুর সঙ্গে সেই সূত্রে প্রসূনের আলাপ। শেষে বিয়ে।

কর্নেল বললেন—বুঝলাম। কিন্তু প্রসূন কেন শান্তকে খুন করবে ?

অরুণ বলল—পলিটিক্যাল রাইভ্যালরি হতে পারে। আবার প্রসূনের এও ধারণা হতে পারে, নীতুর সঙ্গে তার ডিভোর্সের পেছনে শান্তর প্রভোকেশন—বাংলায় কী বলে ঝুম ?

—প্ররোচনা। কর্নেল বললেন।

ঝুমা বলল—অসম্ভব নয়। নীতুর কাছেই শুনেছিলাম একসময় ওর বরের সঙ্গে শান্তর নাকি কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল। মুখ দেখা-দেখি বন্ধ ছিল বহুদিন।

অরুণ সায় দিয়ে বলল—হুঁ মনে পড়ছে। তুমিই বলেছিলে কথাটা।

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন—ফেরা যাক। তোমরা ঘোরো বরং।

বলেই আর পিছু ফিরলেন না। হনহন করে এগিয়ে চললেন সরডিহির দিকে। কিছুক্ষণ পরে কর্নেলের মনে হলো, শান্তর অপমৃত্যুর শোকের একটুও ছায়া যেন পড়েনি দম্পতির মধ্যে। ঝুমার মধ্যে নাও পড়তে পারে। অরুণ তো শান্তর খুড়তুতো ভাই। তার আচরণে এতটুকু শোকের ছাপ নেই।

অবশ্য এও সম্ভব, শান্তর জীবনরীতি বা কাজকর্মে তার আত্মীয়রা

কেউ খুশি ছিল না। হয়তো বিব্রতই বোধ করত। শান্তর মৃত্যুতে তাই হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে।

কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল, কাল সকালে দীনগোপালের বাড়িতে পুলিশ দেখে যখন ওখানে ঢুকেছিলেন, কোনও চোখে জলের ছাপ দেখেননি। শুধু···

কী আশ্চর্য! থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন কর্নেল। শুধু ওই ঝুমাই খুব কেঁদেছে মনে হচ্ছিল।

আর নীতা? তার মুখে শোকের ছাপ ঘন ছিল। কিন্তু চোখ দুটো শুকনোই ছিল। কর্নেলকে দেখামাত্র তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সেটা স্বাভাবিকই। কিন্তু কাল সকালে দীনগোপালের ঘরে যখন ঝুমাকে লক্ষ্য করেন কর্নেল, এমন কী কফি নিয়ে ঢোকার সময়ও—তাকে ভীষণ বিহ্বল দেখাচ্ছিল।

এখন অন্য ঝুমাকে দেখে এলেন। সেই বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠেছে। তাকে শান্ত আর স্বচ্ছন্দ দেখাচ্ছে। প্রসূনকে পুলিশ লক-আপে ঢুকিয়েছে বলেই কি?

অথবা নিজেরই চিন্তা-ভাবনার বেড়াজালে জড়িয়ে অকারণ সবকিছুকে সন্দেহজনক গণ্য করে ফেলছেন তিনি নিজেই। কর্নেল ঝুমার ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেললেন মন থেকে। আবার হাঁটতে থাকলেন।···

বাংলোয় পুলিশের জিপ, তারপর মিঃ পাণ্ডেকে দেখতে পেয়েছিলেন কর্নেল। লনে ঢুকলে পাণ্ডে উত্তেজিতভাবে কিছু বলার জন্য ঠোঁট ফাঁক করেছেন, কর্নেল দ্রুত বললেন—জানি মিঃ পাণ্ডে! শ্রীমতী নীতার হাজব্যাণ্ড প্রসূন ধরা পড়েছে গত রাতে।

পাণ্ডে থমকে গেলেন প্রথমে। তারপর হাসলেন।—এক্স-হাজব্যাণ্ড বলুন?

—এখনও ডিভোর্স আইনত সেটল্‌ড্ হয়নি। লিগ্যাল সেপারেশনের পিরিয়ড চলছে, মিঃ পাণ্ডে! কাজেই আইনত ভুল বলিনি।

লনে রোদে বেতের চেয়ার টেবিল পেতে রেখেছে রামলাল। শীগগির কফি এনে হাজির করল। পাণ্ডে কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন—রামলাল আমাকে খানিকটা বলেছে এবং তার ধারণা, আপনার সঙ্গে তিন নম্বরের বাঙ্গালি সায়েব, মানে প্রসূন মজুমদারের পরিচয় আছে। তার খোঁজেই আপনি বেরিয়েছেন, এও রামলালের বিশ্বাস।

রামলাল বিনীতভাবে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিল। একটু হেসে বলল্—ওহি শোচা, স্যার!

কর্নেল বললেন—তুম আভি ব্রেকফাস্ট বানাও, রামলাল! ফির বাহার যানে পড়ে? পাণ্ডেজিকে লিয়ে ভি!

পাণ্ডে হাত নেড়ে বললেন—নেহি রামলাল! কর্নেল, প্লিজ! এইমাত্র গিন্নির হাতের তৈরি পুরি একপেট খেয়ে বেরিয়েছি।

কর্নেল সেই পোড়ামুখো চুরুটটি জ্বেলে বললেন—আপনাদের আসামীর কথা শোনা যাক।

পাণ্ডে হাসলেন।—সে আপনার কথা বলেছে। তাই ও সি সায়েব আপনার কাছে আমাকে পাঠালেন। আপনাকে নিয়ে দীনগোপাল-বাবুর বাড়ি যেতেও বলেছেন—কাল আপনার সঙ্গে ওঁর কথাও হয়েছে। ওখানে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার ভেতর বললেন—হুঁ কি বলেছে প্রসূন আমার সম্পর্কে?

—আপনি ওকে চেনেন। আর…

—আর?

—কলকাতার সি আই ডি ইন্সপেক্টর মিঃ অমর চৌধুরী নাকি তার জামাইবাবু। রাত্রেই এই ব্যাপারটা কলকাতায় পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে। মিঃ চৌধুরী আজ দুপুরের মধ্যে এসে পড়বেন শ্যালককে সনাক্ত করতে। হ্যাঁ, প্রসূন মজুমদার নামে তাঁর এক বাউণ্ডুলে শ্যালক আছে এবং দীনগোপালবাবুর ভাইঝি নীতার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, সেও ঠিক।

—তাহলে ?

পাণ্ডে গম্ভীর হয়ে বললেন—রাত্রে চুপিচুপি ও-বাড়ি ঢোকার কোনও বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ত দিতে পারেনি প্রসূন মজুমদার।

— কী বলছে সে ?

—আপনার কাছে শান্তবাবুর খুনের খবর শুনেই নাকি ওর মাথার ঠিক ছিল না। কারণ শান্তবাবু নাকি ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। বেশ ! কিন্তু তাই বলে চুপিচুপি ভাঙা দেয়ালের বেড়া গলিয়ে ঢোকার কী উদ্দেশ্য ? জেরায় জেরবার করেও সদুত্তর পাওয়া যায়নি। খালি এক কথা, মাথার ঠিক ছিল না। ধোলাই দিলে হয়তো বেরুত। কিন্তু সি আই ডি ইন্সপেক্টরের শ্যালক। দেখা যাক, যদি মিঃ চৌধুরী এসে বলেন, এটি তাঁর জাল শ্যালক, তাহলেই থার্ড ডিগ্রি চড়াব।

পাণ্ডে পুলিশি উল্লাসে খুব হাসতে থাকলেন। কর্নেল বাংলোর তিন নম্বর ঘরের দিকে তাকিয়ে বললেন—প্রসূনের ঘরটা আশা করি সার্চ করেছেন ?

পাণ্ডে মুখে হাসি রেখেই ভুরু কুঁচকে বললেন—শুনেছি আপনি নানা বিষয়ে জিনিয়াস। তবে আমাদের পুলিশ-মস্তিষ্কে কিছু জ্ঞান-বুদ্ধি থাকা সম্ভব, কর্নেল !

সরি ! আমি শুধু জানতে চাইছিলাম কিছু পাওয়া গেছে নাকি।

—একটা স্যুটকেস পাওয়া গেছে মাত্র। থানায় নিয়ে গিয়ে খোলা হবে। চাবি আসামীর কাছে আছে। তাই এখনই তালা ভাঙার জন্য ব্যস্ত হইনি। হ্যাঁ, স্যুটকেসটা জিপে আছে। দেখতে চান কি ?

পাণ্ডের বলার ভঙ্গিতে ঈষৎ কৌতুক ছিল। কর্নেল কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে চোখ বুজে চুরুট টানতে থাকলেন। একটু পরে পাণ্ডে বললেন—আপনাকে ন'টার মধ্যে দীনগোপালবাবুর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে থানায় ফিরব। ও সি সায়েব বলেছেন, ন'টার আগেই ও-বাড়ি যাবেন। একটু কথা বলা দরকার ওঁর সঙ্গে। এখন পৌনে নটা প্রায়। রামলাল !

কি.চন থেকে সাড়া এল-স্যার!

—কর্নেলসাবকা ব্রেকফাস্ট? জলদি কিও রামলাল!

—আভি যাতা হুজৌর!

ব্রেকফাস্টের ট্রে সাজিয়ে রামলাল এসে গেল। পাণ্ডে বললেন- আপনি চালিয়ে যান।' ততক্ষণ আমি ড্যামের পাখি দেখি। আপনার বাইনোকুলারটা দিন, প্লিজ!

কর্নেল বাইনোকুলার দিলে পাণ্ডে লনের শেষ প্রান্তে পূর্ব দিকের নিচু পাঁচিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ওদিকেই জলাধার। পাখি দেখতে থাকলেন পুলিশ অফিসার ভগবানদাস পাণ্ডে।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বাইনোকুলার ফেরত দিয়ে বললেন—জিনিসটা অসাধারণ! আমি এবার একটা বাইনোকুলার কিনবই। পুলিশের কাজের জন্য সরকার কেন যে বাইনোকুলার দেন না, বুঝি না। সামরিক বাহিনীর বেলায় কিন্তু সরকার একেবারে দিলদরিয়া। কর্নেলের ব্রেকফাস্ট শেষ হয়েছে ততক্ষণে। আবার কফি খাওয়ার অভ্যাস আছে। কিন্তু পাণ্ডের তাড়ায় সেটা হলো না। ঘরে গিয়ে ওভারকোট-হনুমান টুপি খুলে টাক-ঢাকা একটা নীলচে টুপি পরে বেরিয়ে এলেন।

পাণ্ডে ততক্ষণে জিপের কাছে চলে গেছেন। কর্নেল দেখলেন, পাণ্ডে জিপের ভেতর ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ স্থির হয়ে গেলেন কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। তারপর সোজা হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেদ -- কর্নেল! কর্নেল! আশ্চর্য তো!

কর্নেল এগিয়ে যেতে যেতে বললেন—কী ব্যাপার মিঃ পাণ্ডে?

পাণ্ডে পাগলের মতো জিপের ভেতর, পেছনের দিকটায় এবং চারদিকে কখনও গুঁড়ি মেরে, কখনও কাত হয়ে চক্কর দিচ্ছিলেন কর্নেল কাছে গিয়ে তাঁকে দু কাঁধে ধরে মুখোমুখি দাঁড় করালেন। আস্তে বললেন—প্রসূনের স্যুটকেসটা খুঁজছেন কি?

পাণ্ডে নড়ে উঠে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন—অসম্ভব! আমি ওটা সিটের পাশে রেখেছিলাম।

—নেই ?

—নাঃ। কোথাও নেই! বলে পাণ্ডে হাঁক ছাড়ালন—রামলাল! ইধার আও শুয়ারকা বাচ্চা!

রামলাল কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কর্নেল বললেন—রামলাল কিছু জানে না মিঃ পাণ্ডে!

পাণ্ডে হুংকার ছেড়ে বললেন—আলবাৎ জানে! ও ব্যাটাই হাফিজ করে দিয়েছে কোন ফাঁকে।

—না মিঃ পাণ্ডে! এক মিনিট। বলে কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রাখলেন। প্রথমে দক্ষিণে সরডিহি বসতি এলাকা, তারপর পশ্চিমে ঘুরলেন।—ওই দেখুন মিঃ পাণ্ডে! প্রসূনের স্যুটকেস নিয়ে একটা কালো কুকুর এইমাত্র ক্যানেলের পাড় থেকে নামছে।

পাণ্ডের হাতে বাইনোকুলারটি তুলে দিলেন। পাণ্ডে তাঁর নির্দেশ-মতো দেখতে দেখতে বারকতক 'কৈ, কৈ, কোথায়' বলার পর লাফিয়ে উঠলেন।—মাই গুডনেস! কী অদ্ভুত!

কর্নেলের হাতে ফিতে-পরানো দূরবীন যন্ত্রটি ফেরত দিয়েই জিপে ঢুকলেন পাণ্ডে। স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল এবার যন্ত্রটিতে চোখ রাখলেন। এইমাত্র রাস্তা পেরিয়ে কালো কুকুরটি দক্ষিণের মাঠে পৌঁছুল। তারপরই তার মালিককে দেখা গেল। দৌড়ুচ্ছে। নিচু জমিতে আড়াল হয়ে গেল দুজনেই। একটু পরে আবার এক পলকের জন্য দেখা গেল তাদের। এবার লোকটার হাতে স্যুটকেসটা। পাণ্ডের জিপ কাছাকাছি পৌঁছোনোর অনেক আগে ওরা নিপাত্তা হয়ে গেল টিলাগুলোর কাছে।

কর্নেল ঘুরে ডাকলেন—রামলাল!

রামলাল কাঁপা কাঁপা গলায় সাড়া দিল—হুজৌর!

—তোমার কোনও ভয় নেই, রামলাল! ডরো মাৎ!

—জি হুজৌর!

—আচ্ছা রামলাল, সরডিহিমে কিসিকা কালা বিলায়তি কুত্তা হ্যায়?

—নেহি তো! রামলাল বিব্রত মুখে বলল। —হামনে নেহি দেখা স্যার! হাম যব ছোটা থা, রাজাসাবকা কোঠিমে বিলায়তি কুত্তা দেখা। লেকিন কালা কুত্তা! নেহি হুজৌর! আপকা কিরিয়া… রামজিকা কিরিয়া ··বজরঙ্গবলীজিকা কিরিয়া হুজৌর!…

সরডিহি থানার অফিসার-ইন-চার্জ গণেশনারায়ণ ত্রিবেদী সেকেণ্ড অফিসার ভগবানদাস পাণ্ডের তুলনায় স্থিতধী প্রকৃতির মানুষ। কর্নেলের কাছে ঘটনাটি 'লালবাড়ি' অর্থাৎ দীনগোপালের বাড়ির লনে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। শোনার পর প্রথমে একচোট হাসলেন। তারপর বললেন—পাণ্ডেজিকে নিয়ে সমস্যা হলো, সবকিছুতে তর সয় না। রুটিন জব হিসেবেই কাজে নামেন এবং কত শীগগির কাজটা শেষ করে ফেলা যায়, সেদিকেই মনোযোগ দেন বেশি। যেমন দেখুন, এই শান্তবাবুর কেসটা। আমি বেশ বুঝতে পারছি, দৈবাৎ আপনি গিয়ে না পড়লে উনি স্যুইসাইড কেস ধরে নিয়েই যত শীগগির পারা যায় নিষ্পত্তি করে ফেলতেন। এদিকে আমাদের হাসপাতালের মর্গের যা অবস্থা। ডোমই বডি কাটাকুটি করে। নেহাৎ আইনমাফিক একজন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নাকে রুমাল গুঁজে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। ডাক্তারবাবুও তাই। স্পেশাল কেস এবং চাপ না থাকলে কদাচ নিজের হাতে ছুরি ধরবেন না। যাই হোক, কালো কুকুর ব্যাপারটা কেসটাকে ভীষণ ঘুলিয়ে দিল দেখছি। প্রসূন মজুমদারের স্যুটকেসে কী এমন ছিল যে ওটা হাফিজ করে নিয়ে গেল? হুঁ, কালো কুকুরের মালিকের সঙ্গে প্রসূনের ভাল চেনাজানা আছে। আগে থেকে বলা ছিল আর কী! প্রসূন কোনওভাবে বিপদে পড়লে তার সঙ্গী স্যুটকেসটা যেন হাতিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করে। কী বলেন কর্নেল?

ত্রিবেদী দেখলেন কর্নেল যেন তাঁর কথা শুনছেন না। চোখে বাইনোকুলার এবং নিশ্চয় পক্ষীদর্শন। একটু বিরক্ত হলেন মনে

মনে। কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন—আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করছিলাম, কর্নেল!

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে হাসলেন।—শুনেছি। তবে প্রশ্নের জবাব জানা নেই বলে চুপচাপ পাণ্ডেজির অবস্থা দেখছিলাম।

—কী অবস্থা ওঁর?

—দুরবস্থা বলা চলে। হন্যে হয়ে ফিরে আসছেন জিপের দিকে।

লনে দুটো চেয়ার পেতে দিয়ে গেছে নব। ত্রিবেদী এতক্ষণে বসলেন। অনেকটা তফাতে বাড়ির পূবে ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে দীপ্তেন্দু, প্রভাতরঞ্জন, ঝুমা ও অরুণ চাপা গলায় কথা বলছে। দীনগোপাল তাঁর ঘরে। নব কফি আনল এতক্ষণে।

সে চলে যাচ্ছে, কর্নেল ডাকলেন শোনো!

নব ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—চিনি লাগবে স্যার?

না। কর্নেল তাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে দেখতে দেখতে বললেন।—তোমার নাম কী যেন?

—আজ্ঞে নব দাস।

—তুমি কত বছর এ বাড়িতে কাজ করছ?

—তা আজ্ঞে বিশ-বাইশ বছর হবে প্রায়।

—হুঁ, তুমিই শান্তবাবুর ঘরের দরজা ভেঙেছিলে শুনলাম?

নব একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল—আজ্ঞে স্যার···ডাকাডাকি করে সাড়া পাচ্ছিলাম না, তাই···

—তোমার কোনও সন্দেহ হয়েছিল নিশ্চয়?

—হয়েছিল স্যার! অতক্ষণ ধরে ডাকছি, জোরে ধাক্কা দিচ্ছি দরজায়। সাড়া পাচ্ছি না।

কর্নেল সে কথায় আমল না দিয়ে বললেন—কেন সন্দেহ হয়েছিল, বলতে ভয় কী নব?

নব আরও ঘাবড়ে গেল। আমতা-আমতা করে বলল ওই তো বললাম স্যার। ধাক্কা দিয়ে···

—তুমি শান্তবাবুকে কড়িকাঠ থেকে ঝুলতে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে

থানায় খবর দিতে দৌড়েছিলে ?

—হ্যাঁ স্যার !

—কেন ?

কর্নেলের কণ্ঠস্বরে তীব্রতা ছিল। নব একটু ইতস্তত করার পর গলার ভেতর বলল—শান্ত দাদাবাবু পরশু রাত্তিরে আসার পর আমাকে চুপিচুপি বলেছিল, আমার কোনও বিপদ হলে যেন পুলিশে তক্ষুণি খবর দিই।

ত্রিবেদী একটু চটে গিয়ে বললেন—তার মানে, শান্তবাবু টের পেয়েছিলেন তাঁর বিপদ ঘটতে পারে! আশ্চর্য ব্যাপার, তুমি বুদ্ধুর মতো এ কথা চাপা দিয়েছ! বলে বুকপকেট থেকে নোটবই বের করলেন।—কর্নেল! এখানেই শুরু করা যাক। শুভস্য শীঘ্রম্!

কর্নেল বললেন—নব, তুমি কখনও কালো অ্যালসেশিয়ান কুকুর দেখেছ ?

নবর মুখের চমক স্পষ্ট দেখা গেল। ঢোক গিলে বলল—দেখেছি স্যার!

—কোথায় দেখেছ ?

—দিনকতক আগে ওদিকের পাঁচিলে বেড়া গলিয়ে ঢুকছিল। নব বাড়ির পেছনে দক্ষিণ দিকটা আঙুল তুলে দেখাল।—আমি বল্লম নিয়ে ছুটে গেলাম। সাংঘাতিক কুকুর স্যার! খোঁচা খেয়ে তবে পালিয়ে গেল। কর্তামশাই তখন ছিলেন না। ফিরে এলে বললাম।

—কী বললেন উনি ?

—কিছু তো বললেন না।

—আচ্ছা নব, তুমি কখনও সোনার ঠাকুর দেখেছ ?

হঠাৎ এ প্রশ্নে নব হকচকিয়ে গেল।—সোনার ঠাকুর স্যার ? কে—কেন স্যার ?

—আহা, দেখেছ কি না বলো!

নব অবাক চোখে তাকিয়ে বলল—না তো স্যার! চোখে কখনও দেখিনি। তবে শুনেছি।

—কী শুনেছ?

—রাজবাড়ির মন্দিরে নাকি সোনার ঠাকুর ছিল। চুরি হয়েছিল সেটা, তাও শুনেছি।

—পরশু রাত্তিরে বাড়ি পাহারা দিচ্ছিলেন তোমার দাদাবাবুরা। তখন তুমি কোথায় ছিলে?

নব কাঁচুমাচু মুখে হাসবার চেষ্টা করল।—খামোকা হইচই! আসলে মামাবাবুমশাই বরাবর এরকম জানেন স্যার? তিলকে তাল করেন। তবে হ্যাঁ, ওঁর গায়ে জোর আছে বটে। অরুণ দাদাবাবুর মতো তগড়াই লোককে কুপোকাৎ করে ফেলা চাট্টিখানা কথা নয়।

ত্রিবেদী বিরক্ত হয়ে বললেন—শুনেছি। কর্নেল, এবার আমি ওকে একটু বাজিয়ে দেখি।

কর্নেল বললেন—এক মিনিট। নব, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, পরশু রাত্তিরে বাড়ি পাহারার সময় তুমি কোথায় ছিলে?

নব ঝটপট বলল—আমি আমার ঘরেই ছিলাম স্যার! আমার খামোকা শীতের রাত্তিরে ছোটাছুটি পোষায় না। তবে ঘুমোনোর কথা যদি বলেন, তার জো ছিল না। বাইরে ওই দাপাদাপি, এদিকে শান্ত দাদাবাবুর কথাটা মনে গেঁথে আছে—কাজেই ঘুম আসছিল না। সত্যি বলছি স্যার, সারাটা রাত্তির আমি জেগেই কাটিয়েছি। ভোরবেলা কর্তামশাই বেরুলেন। তারপর বসার ঘরে মামাবাবুমশাইয়ের হাতের কাছ থেকে আমার বল্লমটা তুলে নিয়ে গিয়ে ওখানে পুঁতে বেড়াতে বেরুলেন—সব দেখেছি। কর্তামশাই খুব রেগে গেছেন, জানেন?

এই সময় পাণ্ডে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে গেলেন। বললেন—পাত্তা পেলাম না কুকুরটার!

ত্রিবেদী বললেন—আপনি এখনই গিয়ে লক-আপে প্রসূন মজুমদারকে চার্জ করুন। স্যুটকেসে কী ছিল' জানা দরকার। ডিটেলস লিস্ট তৈরি করে ওর সই করিয়ে নেবেন। তারপর কুকুর-টুকুর নিয়ে দেখা যাবে।

পাণ্ডে চলে গেলেন। ত্রিবেদী নবর দিকে তাকালে নব কুণ্ঠিত মুখে বলল—যদি হুকুম দেন, একটা কথা বলি স্যার।

ত্রিবেদী চোখে কটমট করে তাকিয়ে বললেন—কথা তুমি অনেক জানো। বলছ না। বলাচ্ছি থামো!

নব বেজায় ভড়কে করুণ মুখে বলল—আমি তো নিজে থেকেই সব বলছি স্যার! বলছি না?

কর্নেল বললেন—কী বলতে চাইছিলে নব?

নব গলা চেপে বলল—প্রসূনবাবু ভেতরভেতর সাংঘাতিক লোক।

—কীরকম সাংঘাতিক? ত্রিবেদী একটু আগ্রহ দেখালেন।—খুলে বলো' সাংঘাতিক মানে কী?

—নীতা দিদিমণির সঙ্গে বিয়ের পর সেবার এলেন। দিন পনের ছিলেন। তো প্রায় দেখতাম ওই বস্তিতে গিয়ে মহুয়া খাচ্ছে। আর স্যার, সেই মঙ্গল সিং—মংলা ডাকু স্যার, তার সঙ্গে আড্ডা দিতেও দেখেছি।

কর্নেল ত্রিবেদীর দিকে তাকালেন। ত্রিবেদী বললেন—রাজমন্দিরের সোনার ঠাকুর চুরির কেসে প্রথমে মংলা ডাকুকেই পাকড়াও করেছিলাম। বলছি সে কথা। তবে কর্নেল, আমার মনে হচ্ছে দ্য কেস ইজ সেটল্‌ড্‌। থ্যাংক য়ু নব! তোমাকে আর দরকার নেই। কেটে পড়ো।

নব চলে গেলে কর্নেল বললেন—কেস সেটল্‌ড্‌ মানে কী মিঃ ত্রিবেদী?

ত্রিবেদী হাসলেন। সিগারেট ধরিয়ে বললেন—প্রসূন মজুমদারের সঙ্গে মংলা ডাকুর যোগাযোগ ছিল। এদিকে প্রসূন শান্তবাবুর বন্ধু। শান্তবাবু এই এরিয়ার একটা গুপ্ত বিপ্লবী দলের লোক ছিলেন। তাহলে কী দাঁড়াল ব্যাপারটা? বলে একরাশ ধোঁয়া ছাড়লেন।—বলুন, কী দাঁড়াচ্ছে তাহলে?

কর্নেল বললেন—ধোঁয়া!

—সরি! ত্রিবেদী ধোঁয়া হাত দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে

খুব হাসলেন।—হুঁ, আসল কথাটা বলা হয়নি। বললে আপনিও বুঝবেন কেস ইজ সেটল্‌ড্‌। মংলা ডাকুকে সোনার ঠাকুর চুরির কেসে ধরে নিয়ে আটচল্লিশ ঘণ্টা জেরা করা হয়েছিল। মুখ দিয়ে শুধু একটা কথাই বের করানো গিয়েছিল : 'সোনার ঠাকুর চুরি যাবে আমি জানতাম।' ব্যস! এটুকুই।

—তারপর?

ত্রিবেদী নির্বিকার মুখে বললেন–পুরো কথাটা জানবার জন্য থার্ড ডিগ্রি চড়ানো হলো। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। মারা যায় ব্যাটাচ্ছেলে। বুঝতেই পারছেন, এ ক্ষেত্রে পুলিশের পক্ষে যা করা দরকার, তাই করা হয়েছিল। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে তার মৃত্যুর রিপোর্ট তৈরি হলো। কাগজগুলো তা যথারীতি খেল এবং ফলাও করে ছাপল।

—এসব ক্ষেত্রে তো তদন্ত করার কথা! তাছাড়া তার বডি···

কথা কেড়ে ত্রিবেদী দ্রুত বললেন--এটা গত বর্ষার সময়কার ঘটনা। ওই ওয়াটার ড্যামে বডিটা ফেলে দেওয়া হয়। তখন ড্যামের জল ছাড়া হয়েছে। রিপোর্টে লেখা হয়েছিল, বন্যা এলাকায় ডাকাতি করতে যাওয়ার সময় পুলিশ খবর পেয়ে নৌকা নিয়ে তাকে তাড়া করে। নৌযুদ্ধ বলতে পারেন।

ত্রিবেদী অট্টহাসি হাসলেন। কর্নেল বললেন—মঙ্গল সিংয়ের ছবি আপনার থানায় আছে কি?

–আছে। কেন?

কর্নেল একটু গম্ভীর হয়ে বললেন নিছক কৌতূহল। তো 'কেস ইজ সেটল্‌ড্‌' ব্যাপারটা কী?

ত্রিবেদীও গম্ভীর হলেন।—আপনি নিজেও বুঝতে পারছেন না দেখে অবাক লাগছে। দীনগোপালবাবুর হাতে সোনার ঠাকুর দেখার কথা নীতা আপনাকে বলেছেন—আপনিই কাল বললেন। প্রসূনও নিশ্চয় দেখেছিল। নীতাকে বলেনি। ঠাকুর চুরি করেছিল শান্তবাবুর দল। শান্তবাবু সেটা এ বাড়িতে লুকিয়ে রাখেন। তাঁর জ্যাঠা-

মশাইয়ের চোখে পড়ে উনি সেটা হাতান। শান্তবাবু মাল বেহাত হলে দলের ভয়ে কেটে পড়েন। মাইণ্ড দ্যাট, এসবই আপনার থিওরি।

—বেশ। তারপর ?

—প্রসূন শান্তবাবুর দলের লোক। সে এতদিন পরে শান্তকে খুন করে শোধ নিয়েছে—প্রতিহিংসা বলতে পারেন। আক্রোশ বলতে পারেন। তারপর তার প্ল্যান ছিল দীনগোপালবাবুকে খুন করা। গত-রাতে সেই উদ্দেশ্যেই চুপিচুপি এ-বাড়ি ঢুকছিল। ঠিক যেভাবে চুপিচুপি ঢুকে শান্তবাবুর ঘরে খাটের তলায় লুকিয়েছিল।

—প্রসূন গতকাল সন্ধ্যায় এসেছে সরডিহিতে।

ত্রিবেদী জোর গলায় বললেন—কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন ? সে আগেও এসে কোনও হোটেলে থাকতে পারে। তারপর সেচ বাংলোয় উঠে আপনার কাছে ভাল মানুষ সেজেছে!

—কুকুরটা···

কর্নেলকে থামিয়ে ত্রিবেদী বললেন—কুকুরটা ট্রেণ্ড অ্যানিম্যাল। তার মালিক প্রসূনেরই কোনও সহকারী। তার গ্যাংয়ের লোক। স্যুটকেসে নিশ্চয় কোনও ইনক্রিমিনেটিং ডকুমেন্টস ছিল। আড়াল থেকে সে প্রসূনকে গার্ড দিচ্ছিল।

কর্নেল একটু হেসে বললেন—'পিওর ম্যাথ'। বিশুদ্ধ গণিত!

ভুরু কুঁচকে ত্রিবেদী বললেন—হোয়াট'স রং ইন ইট ? গণ্ডগোলটা কেন ? কলকাতায় সুযোগ ছিল।

ত্রিবেদী একটু ভেবে বললেন—মনে হচ্ছে, বাসস্টপের লোকটা প্রসূনই। এভাবে দীনগোপালবাবুর আত্মীয়দের এখানে পাঠিয়ে সে তাদের ঘাড়েই দোষটা চাপাতে চেয়েছিল। জ্যাঠামশাইয়ের সম্পত্তি একটা ফ্যাক্টর। পুলিশ স্বভাবত এই অ্যাঙ্গেলে এগোবে, ভেবেছিল প্রসূন।

—মামাবাবু প্রভাতরঞ্জনকেও এখানে পাঠাল কেন তাহলে ? তার জানার কথা, এই ভদ্রলোক বিচক্ষণ মানুষ। এ বয়সেও এঁর গায়ের জোর অসাধারণ।

ত্রিবেদী হাসলেন।—সেজন্যই প্রভাতবাবুর উপস্থিতি দরকার মনে করেছে, যাতে তাঁকে আমরা প্রথমেই সন্দেহ করি।

কর্নেল নিভন্ত চুরুটটি জ্বেলে বললেন—আপনি অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার। আপনি ভালই জানেন, সব ডেলিবারেট মার্ডার অর্থাৎ পরিকল্পিত খুনের প্রধানত ছুটো মোটিভ থাকে। পার্সোনাল গেইন-ব্যক্তিগত লাভ বা কোনও স্বার্থসিদ্ধি এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা। আপনি কি মনে করেন, প্রসূন এটুকুও বোঝে না যে প্রভাতবাবুর মোটিভ আপনারা খুঁজে পাবেন না কিংবা আইনত সাব্যস্তও করতে পারবেন না?

ত্রিবেদী ফের অট্টহাসি হাসলেন। - কর্নেল! এই এরিয়া সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা নেই। যাই হোক, আমাদের হাতে রেকর্ডস আছে। এটাই সুবিধে। প্রভাতবাবু ওদিকে ফিরোজাবাদে খনি এলাকায় ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতি করতেন। এখন অবশ্য আর রাজনীতি করেন না—অন্তত ওই এলাকায় করেন না। যখন করতেন, তখন শান্তবাবুদের দলের সঙ্গে ওঁদের প্রচণ্ড শত্রুতা ছিল। প্রসূনের মাথায় এই অ্যাঙ্গেলটাও কাজ করে থাকবে।

কর্নেল সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন—হুঁ, পিওর ম্যাথ।

গণেশ ত্রিবেদী ঘড়ি দেখে বললেন—যাই হোক, আসল কাজ শুরু করা যাক। দেরি হয়ে গেল বড্ড। তো প্রভাতবাবুর কথা যখন উঠল, ওঁকেই প্রথমে ডাকা যাক।...

## ॥ ছয় ॥

প্রভাতরঞ্জনের পরনে এখন পাঞ্জাবি, পাজামা, জহর কোট এবং আলতোভাবে একটা পুরু আলোয়ান জড়ানো গায়ে। ছু'হাতে পশমি দস্তানা, পায়ে পশমি মোজা ও পামসু। মুখে বিষণ্ণ গাম্ভীর্য। নমস্কার করে বসলেন। নব ইতিমধ্যে আর একটা চেয়ার এনে দিয়েছিল পুলিশের হুকুমে। একটু তফাতে দাঁড়িয়েও ছিল সে। ত্রিবেদীর

ধমকে কেটে পড়ল। প্রভাতরঞ্জন হাসবার চেষ্টা করে বললেন—দীনুদার এই লোকটা একটু নাক-গলানে স্বভাবের। দেখলে বোঝা যায় না কিছু, কিন্তু বেজায় চালাক। এতক্ষণ তো জেরা করলেন ওকে। কিছু বের করতে পারলেন পেট থেকে? পারবেন না। আমি ওকে হাড়েহাড়ে চিনি।

ত্রিবেদী একটু হেসে বললেন—আপনার নামের সঙ্গে আমি পরিচিত। চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য হলো এতদিনে। আপনার নামে ফিরোজাবাদ এলাকায় বিস্তর গল্প চালু আছে।

— থাকা উচিত। প্রভাতরঞ্জন ঈষৎ গর্বিত ভঙ্গিতে বললেন।—আমি জেলের পাঁচিল টপকে পালিয়েছিলাম। আপনারা ধরতে পারেননি। শেষে নিজেই ধরা দিয়েছিলাম। আমার পার্টি ক্ষমতায় এলে ছাড়াও পেয়েছিলাম। তবে মশাই, সত্যি বলছি—আর রাজনীতি ব্যাপারটা শিক্ষিত এবং আদর্শবাদীর জন্য নয়। এখন রাজনীতি হলো মতলববাজ আর রাজ্যের মস্তানদের আখড়া। কাজেই ইস্তফা দিয়ে দূরে সরে এসেছি। এ বয়সে নোংরা ঘাঁটতে পারব না।

প্রভাতরঞ্জনের মুখভাব বদলে বিকৃত হয়ে গেল। ত্রিবেদী বললেন—আপনি তো নীতা দেবীর মামা?

—হ্যাঁ। নীতার বাবা জয়গোপাল আমার রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গী ছিল। আমার বোনও রাজনীতি করত। আমিই ওদের পার্টি ম্যারেজের ব্যবস্থা করেছিলাম। ঘটকালিই বলতে পারেন।

—আপনার ঠিকানাটা, প্লিজ?

—লিখে নিন: ভিলেজ এ্যাণ্ড পোস্ট অফিস ইণ্ডিয়া! ইণ্ডিয়া কেন, পৃথিবীই লিখুন!

প্রভাতরঞ্জনের মুখে কৌতুকের ছাপ। ত্রিবেদী ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিলেন। বললেন—তামাশা করার জন্য আমি আসিনি প্রভাতবাবু! অফিসিয়্যালি এসেছি। তাছাড়া এটা পোলিশ ইনভেস্টিগেশন।

প্রভাতরঞ্জন একটুও না দমে গিয়ে বললেন—যা সত্যি তাই

বলছি। আমার কোনও বিশেষ ঠিকানা নেই। ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে। সেই যে পদ্যে আছে: 'সব ঠাঁয়ে মোর ঘর আছে....'

—আপনি নিজেকে ভবঘুরে বলছেন?

—ঠিক টার্মটি হলো 'যাযাবর'।

ত্রিবেদী বিরক্ত হয়ে বললেন—আপনার জানা উচিত, ভবঘুরে বিষয়ে একটা আইন আছে।

—অবশ্যই জানি। গ্রেফতার করুন সেই আইনে। তারপর আপনাদের স্টেটের হোম দফতর, মানে পুলিশ যার অধীনে তার মিনিস্টার খবর পাবেন। তিনি আমার সঙ্গে একসময় ট্রেড ইউনিয়ন করতেন। তারপর....

ত্রিবেদী সঙ্গে সঙ্গে নেতিয়ে গিয়েছিলেন। কর্নেল দ্রুত বললেন—প্রভাতবাবু, আপাতত সরডিহি এসেছেন তো কলকাতা থেকেই?

—পথে আসুন। প্রভাতরঞ্জন অমায়িক হাসলেন। —হ্যাঁ, কলকাতা থেকেই। সে-ঠিকানা অবশ্য দিতে পারি। লিখুন: কেয়ার অফ অনন্তকুমার হাটি, অ্যাডভোকেট এবং প্রাক্তন এম এল এ। ১২২/২ সি হরিনাথ আঢ্যি লেন, কলকাতা-৭৯। এখানে তেরাত্তির ছিলাম। তার আগেরটা বলি, লিখে নিন।

—থাক। আচ্ছা প্রভাতবাবু, আপনার বয়স কত হলো?

বাষট্টি বছর তিন মাস বারো দিন।

—আপনি সমস্ত ব্যাপারে খুব পার্টিকুলার!

—অন্তত চেষ্টা করি পার্টিকুলার থাকতে।

—আপনার সবদিকে দৃষ্টি প্রখর। কারণ গতরাতে আপনিই প্রসূনকে বেড়া গলিয়ে ঢুকতে দেখেছিলেন।

—হুঁউ। প্রভাতরঞ্জন সগর্বে বললেন। —আমি কড়া নজর রেখেছিলাম। অন্ধকারেও আমি দেখতে পাই।

—কিন্তু কাল দিনের বেলাতেই কালো কুকুরটা আপনি দেখতে পাননি!

প্রভাতরঞ্জন তাচ্ছিল্য করে বললেন আপনি ডিটেকটিভ।

আপনার প্রশ্নের লক্ষ্য কী জানি না। তবে কুকুর ইজ কুকুর—স্বাভাবিক প্রাণী। সবখানেই ঘোরে। সন্দেহজনক কিছু গণ্য হলে তবে তো সেদিকে মানুষের চোখ পড়ে।

কর্নেল একটু হাসলেন। —বাসস্টপের লোকটাকেও চিনতে পারননি!

প্রভাতরঞ্জন নড়ে বসলেন। —তখন পারিনি। এখন পারছি। শয়তান প্রসূনই ছদ্মবেশে…

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন—তার উদ্দেশ্য কী থাকতে পারে? এভাবে আপনাদের সরডিহিতে জড়ো করবে কেন?

—দীনুদা আমাদের সকলেরই প্রিয়জন। কাজেই ও জানে, দীনুদার বিপদের কথা বললে আমরা সবাই এখানে এসে জড়ো হবো। প্রভাতরঞ্জন জোর গলায় বললেন। —শান্তর সঙ্গে ওর শত্রুতা ছিল। ও শান্তকে খতম করতে চেয়েছিল আসলে। এখানে খতম করলে আমাদেরই কারও না কারও ঘাড়ে দায়টা পড়বে। দীপ্তেন্দুর মাথায় এটা এসেছে। একটু আগে এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ও ঠিক ধরেছে। দীনুদার ভাইপোদের ঘাড়ে দায় পড়তই।

—কেন?

—দীনুদার সম্পত্তি।

—সোনার ঠাকুর?

মুহূর্তে প্রভাতরঞ্জনের উত্তেজনা নিভে গেল। —সোনার ঠাকুর! কথাটা ঠাণ্ডা হিম হয়ে বেরিয়ে এল। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ফের বললেন সোনার ঠাকুরটা কী?

—আপনি কখনও সোনার ঠাকুর দেখেননি প্রভাতবাবু?

—দীনুদা নাস্তিক। এ বাড়িতে ঠাকুরই নেই তো সোনার ঠাকুর! কর্নেল প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলেন—আপনি কখনও সোনার ঠাকুর দেখেননি?

এবার প্রভাতরঞ্জন একটু হাসলেন। —কোনও ক্লু পেয়েছেন

বুঝি? ব্যাপারটা কী খুলে বলুন তো? আপনি ডিটেকটিভ। জীবনে এই প্রথম ডিটেকটিভ দেখলাম। তবে পলিটিক্যাল লাইফে পুলিশের আই বি বিস্তর দেখেছি। যাই হোক, 'কালো কুকুর' এবং 'আড়ালের লোকটা' ছিল। এবার এল 'সোনার ঠাকুর'। বলে ত্রিবেদীর দিকে ঘুরলেন। —মিঃ ত্রিবেদী, এই ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের যা বয়স, তাতে—সরি! অভদ্রতা করতে চাইনে। আমার ভাগনিই এই গণ্ডগোলটি বাধিয়েছে। কিছু প্রশ্ন করার থাকলে আপনি করুন। ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের প্রশ্নগুলো শুনে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাচ্ছে।

ত্রিবেদী নোট করছিলেন। মুখটা নিচু। মুখ তুললেন। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই কর্নেল বললেন—আপনি কোন হোটেলে উঠেছিলেন প্রভাতবাবু?

—আপনার প্রশ্নের জবার দেব না।

ত্রিবেদী বললেন—ঠিক আছে। প্রশ্নটা আমিই করছি।

—তাহলে জবাব দিচ্ছি। হোটেল পারিজাতে। রুম নম্বর ২২। দোতলায়।

ত্রিবেদী বললেন—আপনি মঙ্গল সিং নামে কাউকে চিনতেন? এই এরিয়া তো আপনার পরিচিত।

—হুঁউ। নাম শুনেছিলুম। কেন বলুন তো? প্রভাতরঞ্জন কর্নেলের দিকে কটাক্ষ করে ফের বললেন—ট্রেড ইউনিয়ন করতাম বটে, ডাকাতি করার দরকার হয়নি। জানেন তো? ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের অনেক টাকা রোজগারের স্কোপ থাকে। তাছাড়া এখন আমি আর ওসবে নেই। আর ডাকু মঙ্গল সিংও শুনেছি বেঁচে নেই। আপনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা গেছে—কাগজে পড়েছিলাম।

—পরশু রাত্তিরে কটা অব্দি শান্তবাবুকে দেখেছিলেন?

—সঠিক লাইনের প্রশ্ন। প্রভাতরঞ্জন মুখে আগ্রহ ফুটিয়ে বললেন। —রাত্তির চারটে অব্দি আমরা বাড়ি পাহারা দিয়েছি। চারটে বাজলে সবাইকে শুতে যেতে বলি। শান্তও দোতলায় চলে

যায়। আমি নিচে বসার ঘরে সোফায় শুয়ে পড়ি। ঘুমিয়ে গিয়েই বিপদটা হলো।

—শান্তবাবু গুপ্ত বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমরা জানি আপনার দলের সঙ্গে ওদের প্রচণ্ড শত্রুতা ছিল। আমাদের রেকর্ড তাই বলে।

প্রভাতরঞ্জন নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন—আমি এতকাল বাদে শান্তকে সেজন্য খুন করেছি? বিষাক্ত ইঞ্জেকশান করে তারপর লটকে দিয়েছি? ইজ ইট? সেজন্য তার ঘরে ঢুকে খাটের তলায় বলে জোরে হাসলেন। —কিন্তু খাটের তলায় ঢুকলাম কখন? শান্তর পিছুপিছু গিয়ে?

—সরি প্রভাতবাবু! তা বলছি না। ত্রিবেদী দ্রুত বললেন। —জাস্ট জানতে চাইছি, শান্তবাবুর বিরুদ্ধে কোনও পুরনো রাজনৈতিক আক্রোশ কারও ছিল কিনা? তার মানে, তেমন কাউকে আপনার মনে পড়ছে কিনা?

—ওসব কোনও পয়েন্টই নয়। প্রভাতরঞ্জন শক্ত মুখে বললেন কথাটা। প্রসূনই খুনী। প্রসূনের সঙ্গে শান্তর গণ্ডগোল হয়েছিল শুনেছি। পলিটিক্যাল রাইভ্যালরি। নীতু বলতে পারে। তাকে জিজ্ঞেস করবেন। একই দলের দুটো ফ্যাকশনের মধ্যে বিবাদ। আজকাল তো এরকমই ঘটছে। ঘটছে না?

ত্রিবেদী কর্নেলের দিকে তাকালেন। কর্নেল বললেন—এই যথেষ্ট। এবার বরং নীতাকে ডাকুন।

প্রভাতরঞ্জন উঠে পা বাড়িয়েছেন, কর্নেল হঠাৎ ডাকলেন - প্রভাতবাবু, এক মিনিট।

প্রভাতরঞ্জন ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—আপনার এলেবেলে প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।

—আপনি কি মাফলার ব্যবহার করেন না?

প্রভাতরঞ্জন প্রচণ্ড চমকে উঠেছিলেন। সামলে নিয়ে বললেন — মাথার ঠিক নেই। বলব বলে এসে আপনারই উদ্ভট সব প্রশ্নে কথাটা

ভুলে গেছি। এতক্ষণ সেই নিয়ে···মানে, নীতাই কথাটা তুলেছিল।

—ডোরাকাটা মাফলারটা আপনারই?

প্রভাতরঞ্জন গুম হয়ে বললেন—হ্যাঁ। গলায় জড়িয়ে সোফায় শুয়ে পড়েছিলুম। পরে শান্তর লাশের গলায় দেখে চমকে উঠি। পাছে আমার ওপর সন্দেহ জাগে, চেপে রেখেছিলাম। তবে আমি সময় মতো বলতামই। আসলে আমিও গোয়েন্দার মতো তদন্ত করছি-- তাই···

হাত তুলে কর্নেল বললেন। —ঠিক আছে। ও নিয়ে ভাববেন না। নীতাকে পাঠিয়ে দিন।

প্রভাতরঞ্জন খুব আস্তে হেঁটে গেলেন। ত্রিবেদী অবাক হয়ে বললেন—আপনি দেখছি সত্যিই অন্তর্যামী, কর্নেল! ব্যাপারটা কী?

কর্নেল একটু হাসলেন। —আমি নিজেই নিজের প্রশ্নে অবাক হয়েছি, মিঃ ত্রিবেদী।

—তার মানে?

কর্নেল দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন—হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রশ্নটা। কেন বেরুল, সঠিক বলা কঠিন। তবে এটুকু ব্যাখ্যা করা যায়, প্রভাতবাবু যে-পোশাক পরে আছেন, তার সঙ্গে একটা মাফলার মানানসই হতো। বিশেষ করে বিহার মুলুকে মাফলারের রেওয়াজ এ মরশুমে অহরহ চোখে পড়ে। তবে এও ঠিক ওঁর মাথায় শীতের পশমি টুপি থাকলে প্রশ্নটা আমার মাথায় আসত না। আজ ঠাণ্ডাটা বেশ বেড়েছে—তাই না?

ত্রিবেদী ভাবতে ভাবতে বললেন—যাই হোক, একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র বেরিয়ে এল। ওদিকে আপনার কথামতো সরভিহিবাজারে ডোরাকাটা মাফলার কে সম্প্রতি কিনেছে, সেই খোঁজে লোক লাগিয়েছি।

—সূত্রটা গুরুত্বপূর্ণই বটে। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, প্রভাতবাবু নিচের বসার ঘরের সোফায় ঘুমিয়ে পড়ার পর খুনী ওঁর গলা থেকে সাবধানে মাফলার খুলে নিয়ে গেছে।

—চারটে থেকে ভোর ছটার মধ্যে।

—ঠিক। কিন্তু কেন?

—শান্তবাবুর বডি কড়িকাঠে লটকানোর জন্য, যাতে আত্মহত্যা সাব্যস্ত করা যায়!

কর্নেল বেতের টেবিলে একটা চুরুট খেলাচ্ছলে ঠুকতে ঠুকতে বললেন—সেজন্য শান্তর মাফলার ছিল। তার চেয়ে বড় প্রশ্ন, খুনী নিচে থেকে ওপরে উঠেছিল না ওপর থেকে নিচে নেমে এসেছিল? এটা একটা বড় প্রশ্ন।

ত্রিবেদী নড়ে বসলেন। —অবশ্যই বড় প্রশ্ন। তবে তার উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে। পোস্টমর্টেমের একটা রিস্ক থেকে যায়। তাই খুন প্রমাণিত হলে যাতে প্রভাতবাবুর ঘাড়েই দায়টা চাপে, তার ব্যবস্থা করেছিল। তার মানে, সে প্রভাতবাবুরও শত্রু। অথবা প্রভাতবাবুকে ব্ল্যাকমেইল করার উদ্দেশ্য ছিল কোনও কারণে।

বলে পয়েন্টগুলো ঝটপট নোট করে ফেললেন ত্রিবেদী। সেই সময় নীতা এল। তাকে ইশারায় বসতে বললেন ত্রিবেদী। কর্নেল তার দিকে তাকালে সে আস্তে বলল—একটা অদ্ভুত ব্যাপার কর্নেল! শান্তদার গলায় যে মাফলারটা আটকানো ছিল, সেটা মামাবাবুর। কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ আমারই খেয়াল হলো…

—জানি। কর্নেল তাকে থামিয়ে দিলেন। —কেয়া চৌধুরী নামে কোনও মহিলাকে তুমি চেনো?

—হ্যাঁ। কেয়াদিই আপনার কাছে যেতে বলেছিলেন আমাকে। আমি আপনাকে অত খুলে বলিনি।

—কেয়া চৌধুরী প্রসূনের দিদি?

নীতা মুখ নামিয়ে গলার ভেতর বলল—হ্যাঁ। এখন বুঝতে পারছি সব কথা আপনাকে খুলে বলা উচিত ছিল।

—কী কথা?

—কেয়াদি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে আমার মিটমাটের চেষ্টা করছিলেন। একটা আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বাসস্টপে একটা লোক সন্ধ্যাবেলা…

কর্নেল ফের তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—প্রসূনের সঙ্গে শান্তর শত্রুতা ছিল?

—না তো! শান্তদাও আমাকে বকাবকি করত। বলত, মিটমাট করে নে। নীতু মুখ নামিয়ে ফের বলল—আসলে আমার বাবা মায়ের প্রভাবে ছোটবেলা থেকে ড্রিঙ্কের বিরুদ্ধে আমার তীব্র অ্যালার্জি ছিল। বাবা-মা গান্ধীজীর আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। আমিও সেই পরিবেশে বড় হয়েছি। মাতাল দেখলে আমার প্রচণ্ড ঘৃণা হতো। আমি জানতাম না প্রসূন ড্রিঙ্ক করে। বিয়ের পর জেনেছিলাম। সেই থেকে আমাদের রিলেশান নষ্ট হতে শুরু করে। বিশেষ করে জ্যাঠামশাইয়ের এখানে হনিমুনে এসে ওকে বস্তির লোকদের সঙ্গে কুচ্ছিৎ ওইসব জিনিস খেতে দেখলাম। তখন আর সহ্য করতে পারিনি।

—কীভাবে দেখলে?

—এ বাড়ির দোতলা থেকে ওপাশের বস্তিটা দেখা যায়। এক বিকেলে ওকে খাটিয়ায় বসে একটা লোকের সঙ্গে ওই রাবিশ খেতে দেখেছিলাম। নবকে ডেকে দেখালাম। নব বলেছিল, লোকটা নাকি সাংঘাতিক ডাকত। তাই আরও ঘৃণা—আর একটু সন্দেহও হয়েছিল প্রসূনের ওপর। শুনেছিলাম, শান্তদার দলের লোকেরা নাকি ডাকাতি করত এবং প্রসূন শান্তদার বন্ধু।

—পরশু রাতে সবাই যখন নিচে পাহারা দিচ্ছিল, তুমি কোথায় ছিলে?

—নিচে ঝুমা বউদির কাছে। আমরাও জেগে ছিলাম চারটে অব্দি। তারপর ওপরে গিয়ে আমি শুয়ে পড়ি। ছটায় জ্যাঠামশাই কখন বেরোন, জানতে পারিনি। একটু পরে নিচে চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভাঙে। নিচে গিয়ে শুনি মামাবাবুর বল্লমটা

কর্নেল হাত তুলে বললেন—তোমার ঘর আর শান্তর ঘরের মধ্যে করিডর। তোমার ঘর থেকে কোনও অস্বাভাবিক শব্দ শুনতে পেয়েছিলে কি?

নীতা একটু ভেবে বলল - ভীষণ ঘুম পেয়েছিল। শুধু শান্তদার ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ…বলে নীতা একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। —হ্যাঁ, হ্যাঁ! কী সব শব্দ…অস্বাভাবিক শব্দ! কিন্তু ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে এসেছিল। ··আপনি বলায় মনে পড়ছে। দরজা আবার খোলা বা বন্ধ হওয়ার শব্দ, কেউ কিছু বলল…কিংবা ওইরকম কী সব।

—হুঁ। তুমি কি মনে করো প্রসূন শান্তকে খুন করেছে?

নীতা জোরে মাথা নেড়ে বলল - নাঃ। কেন করবে? ওরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।

—সোনার ঠাকুর নিয়ে কোনও বিবাদ হতে পারে দুজনের মধ্যে?

—কী করে হবে? আমি ছাড়া কেউই জানে না, বা দেখেওনি জ্যাঠামশাইয়ের কাছে একটা সোনার ঠাকুর আছে। আমি কাউকে বলিনি এ পর্যন্ত আপনাকে ছাড়া।

ত্রিবেদী প্রশ্ন করলেন · আর য়ু সিওর?

—নিশ্চয়। নীতা শক্ত মুখে বলল। - তাছাড়া জ্যাঠামশাইয়ের পেট থেকে কোনও কথা বেরোয় না, আমি জানি।

কর্নেল বললেন—কিন্তু তুমি আমাকে বলেছ, সোনার ঠাকুর নিয়েই জ্যাঠামশায়ের বিপদের আশঙ্কা করছ!

হ্যাঁ। জাস্ট একটা সন্দেহ। কারণ জ্যাঠামশায়ের কোনও শত্রু নেই। তাই ভেবেছিলাম, সোনার ঠাকুরটার কথা কেউ যেভাবে হোক জানতে পেরেছে। তাঁর কোনও ওয়েল-উইশার সেজন্য আমাকে… নীতা বিব্রত মুখে চুপ করল। শ্বাস ফেলে ফের বলল—ব্যাপারটা রহস্যময় বলেই প্রথমে কেয়াদির কাছে গিয়েছিলাম। কারণ ওঁর স্বামী সি আই ডি পুলিশ।

—কেয়া দেবীকে তুমি সোনার ঠাকুরের ব্যাপারটা বলেছিলে

—হ্যাঁ। না বললে তো…

—তুমি কেয়া দেবীকে সোনার ঠাকুরের কথা বলেছিলে? কর্নেল ফের প্রশ্ন করলেন। অথচ তুমি একটু আগে বললে, আমাকে ছাড়া আর কাউকে বলোনি!

নীতাকে আরও বিব্রত দেখাল। বলল—বলা দরকার মনে করেছিলাম। শুনে কেয়াদি বললেন, আমার কর্তার মাথা মোটা। বিহারে গিয়ে পুলিশ জড়ো করে হইচই বাধাবে। বরং তুমি কর্নেল-সায়েবের কাছে যাও। আমি আপনার সম্পর্কে কেয়াদির কাছে সাংঘাতিক সব কীর্তির কথা শুনলাম। তাই আপনার কাছে গেলাম। জানি, কেয়াদি কাউকে ঠাকুরের কথা বলবে না।

এই সময় প্রভাতরঞ্জনকে হন্তদন্ত আসতে দেখা গেল। চিৎকার করতে করতে আসছেন—রহস্য! রহস্য! বদমাইশি অ্যাণ্ড রহস্য!

তাঁর হাতে একটা ডোরাকাটা মাফলার। জোরে নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন - দেখছেন কাণ্ডটা? এই হচ্ছে আমার মাফলার। এইমাত্র নব বসার ঘর সাফ করতে গিয়ে উদ্ধার করেছে। সোফার তলায় পড়ে ছিল। খামোকা আমাকে ফাঁসানোর তালে ছিলেন এই ডিটেকটিভ ভদ্রলোক!

ত্রিবেদী মাফলারটা নিয়ে পরীক্ষা করে কর্নেলকে দিলেন। কর্নেল তখনই প্রভাতরঞ্জনকে ফেরত দিয়ে বললেন—কিছু মনে করবেন না প্রভাতবাবু! বুড়ো হয়ে গেছি। বুদ্ধিভ্রংশ হওয়া স্বাভাবিক। নীতা, তুমি এসো। প্রভাতবাবু, দয়া করে ঝুমা দেবীকে পাঠিয়ে দিন।

প্রভাতরঞ্জন বীরদর্পে ভাগনিসহ সোজা বাড়ির বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। দীপ্তেন্দু, অরুণ ঝুমা বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। নব বারান্দায় ঝাড়ু হাতে বেরুল। প্রভাতরঞ্জন মাফলারটা নেড়ে ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন।

একটু পরে ঝুমা এল। কর্নেল বললেন—বসো। তখন ঝুমা কুণ্ঠিত মুখে বসল। তাকে একটু নার্ভাস দেখাচ্ছিল।

কর্নেল বললেন—তুমি সকালে ওই ব্রিজের ওখানে বলছিলে, নীতার কাছে শুনেছ যে প্রসূন আর শান্তর মধ্যে কী নিয়ে ঝগড়া ছিল!

ঝুমা বলল—হ্যাঁ, নীতা বলেছিল। কিন্তু এখন অন্য কিছু বলেছে বুঝি?

—হ্যাঁ। বলল, দুজনের খুব বন্ধুত্ব ছিল। শত্রুতা ছিল না।

ঝুমার চোখ জ্বলে উঠল।—তাই বলল নীতা? আশ্চর্য মেয়ে তো! আমাকে মিথ্যাবাদী সাজাল!

—আচ্ছা ঝুমা, নীতার সঙ্গে প্রসূনের বিয়ের আগে তুমি কি প্রসূনকে চিনতে?

ঝুমা বাঁকা মুখে বলল—নাঃ। অমন আজেবাজে লোকের সঙ্গে আমার পরিচয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

·শান্তকে তুমি তোমার বিয়ের আগে থেকে চিনতে?

ঝুমা তাকাল। একটু পরে বলল—নীতা বলল বুঝি?

—না। আমিই জানতে চাইছি।

ঝুমা চুপ করে রইল। মুখটা নিচু। ঠোঁট কামড়ে ধরল।

—শান্তর সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল?

ঝুমার চোখে জল এসে গেল। আস্তে বলল · ছিল। কেন?

কর্নেল চুরুট জ্বেলে তারপর বললেন-- শান্তর মৃত্যুতে তুমি সবচেয়ে কষ্ট পেয়েছ। আমার চোখ, ঝুমা! এ চোখকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। কাজেই আমিই তোমাকে প্রশ্ন করছি, কেন তুমি সবার চেয়ে বেশি কষ্ট পেলে?

ঝুমা এবার দুহাতে মুখ ঢাকল। সে নিঃশব্দে কাঁদছিল।

ত্রিবেদী অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ খাপ্পা হয়ে বললেন—কান্নাটান্না পরে। কর্নেলের প্রশ্নের জবাব দিন।

ঝুমা মুখ থেকে হাত সরিয়ে ভেজা চোখে তীব্র দৃষ্টি রেখে বলল—দ্যাটস্ মাই পার্সোনাল এ্যাফেয়ার। আমি জবাব দেব না।

ত্রিবেদী আরও খাপ্পা হয়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন, কর্নেল তাঁকে নিবৃত্ত করে শান্তস্বরে বললেন—প্লিজ ঝুমা! আমি শান্তর হত্যাকারীকে খুঁজছি। তোমার সহযোগিতা চাই। ভুল বুঝো না।

ঝুমা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল—আমার সঙ্গে শান্তর একটা ইমোশনাল সম্পর্ক ছিল। কিন্তু ও বিয়েতে রাজী হয়নি। পরে

অরুণের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। বাট আই লাভ মাই হাজব্যাণ্ড কাজেই পাস্ট, ইজ পাস্ট।

—ঝুমা! পরশু রাত্তিরে শান্তর সঙ্গে তোমার কোনও কথা হয়েছিল?

—পরশু রাত্তিরে এক ফাঁকে শান্ত আমাকে চুপিচুপি বলেছিল, হয়তো এভাবে তাকেই একটা ফাঁদে ফেলা হয়েছে। জ্যাঠামশাইয়ের নয়, হয়তো তারই কোনও বিপদ ঘটতে পারে। ব্যাপারটা খুলে বলার সুযোগ ও আর পায়নি। মামাবাবু একটুতেই ডাকাডাকি হইচই বাধিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।

ত্রিবেদী তাকালেন কর্নেলের দিকে। বললেন—নবও ঠিক একই ........ওকে!

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে ঝুমাকে বললেন—তুমি কখনও শান্তর কাছে সোনার ঠাকুরের কথা শুনেছ?

ঝুমা চোখ মুছে ভাঙা গলায় বলল- শান্ত বেঁচে নেই। কাজেই এখন বলা যায়— বলা উচিত।

—বলো, ঝুমা!

শান্তর পলিটিক্যাল গ্রুপ সরডিহি রাজবাড়ির মন্দির থেকে সোনার ঠাকুর ডাকাতি করেছিল। আমাকে শান্ত বলেছিল।

—তারপর, তারপর? ত্রিবেদী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

ঝুমা বলল—শান্ত সোনার ঠাকুরটা এনে লুকিয়ে রাখে। যে-ঘরে ও খুন হয়েছে, ওই ঘরে। তারপর নাকি ওটা চুরি যায় ও-ঘর থেকে।

কর্নেল বললেন—কিভাবে চুরি যায়, বলেনি?

—বলেছিল। কাগজে মুড়ে বালিশের তলায় রেখেছিল। তারপর বাইরে থেকে এসে আর ওটা খুঁজে পায়নি। দলের লোকের কাছে কৈফিয়ত দেওয়ার ভয়ে পালিয়ে যায় সরডিহি ছেড়ে।

ত্রিবেদী বললেন—সঠিক দিকেই আমরা এগিয়েছিলাম তাহলে। হ্যাং-গো অন প্লিজ।

কর্নেল বললেন— আর কিছু জানো এ সম্পর্কে?

—না। ঝুমা মাথা নাড়ল। —আমি ওকে বরাবর নিষেধ করতাম, যেন সরডিহি না যায়। তবু কেন ও বোকামি করল বুঝতে পারছি না। পরশু রাত্তিরে ও যখন কথাটা বলল, ওকে সাবধান করে দিয়েছিলাম।

—ঠিক আছে। তুমি আসতে পারো, ঝুমা! তোমার স্বামীকে—না, দীপ্তেন্দুকে পাঠিয়ে দাও।

ঝুমা চলে গেলে ত্রিবেদী হাসলেন। —এ পর্যন্ত শুধু এটুকু জানা গেল, এই খুনের সঙ্গে সেই সোনারঠাকুর চুরির কেস জড়িত। প্রসূন, কর্নেল! প্রসূনই বারবার ফ্রন্টে এসে যাচ্ছে।

কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন। কোনও মন্তব্য করলেন না। দীপ্তেন্দু এসে নমস্কার করে বসল। ত্রিবেদী প্রথমে তার নাম-ঠিকানা-পেশা লিখে নিলেন। তারপর কর্নেলকে বললেন—আপনিই শুরু করুন। আমি নোট করি।

কর্নেল মিষ্টি হেসে বললেন—তুমি বললে, আশা করি কিছু মনে করবে না।

দীপ্তেন্দু গম্ভীর মুখে বলল—না। বলুন না।

—তুমি তো মেডিকেল কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ?

—হ্যাঁ। বাবা ডাক্তার ছিলেন। আমি ডাক্তার হতে পারিনি। তবে বাবার চেনাজানার সুযোগ অগত্যা এই পেশাটা জোটাতে পেরেছি। এই নিন আমার কার্ড। এই পেশা না জোটাতে পারলে শান্তর মতো সাংঘাতিক একটা কিছু করে বেড়াতাম। বাঁচাটাই পাপ এ যুগে।

—তুমি কি কোনও কারণে উত্তেজিত? কার্ডটা দেখতে দেখতে কর্নেল বললেন।

—হ্যাঁ। এবং উদ্বিগ্নও। আমার সঙ্গে সবসময় কিছু ওষুধপত্তর থাকে। তো একটা ওষুধ···

কোনও ওষুধ হারিয়েছে?

দীপ্তেন্দু নড়ে উঠল। —হারিয়েছে। সাংঘাতিক ওষুধ।

—ইঞ্জেকশানের ওষুধ কি ?

—হুঁঃ। দীপ্তেন্দু মুখ নামিয়ে বলল। —মর্ফিয়ার বিকল্প নতুন একটা ওষুধ আমার কোম্পানি বের করেছে। তার দুটো স্যাম্পল ছিল—দুটো অ্যাম্পুল। একটা নেই। নিকোটিন থেকে তৈরি ওষুধ। নির্দিষ্ট ডোজের বেশি ইঞ্জেক্ট করলেই মানুষ মারা পড়বে।

ত্রিবেদী প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রশ্ন করলেন—কখন দেখলেন একটা অ্যাম্পুল নেই ?

—কাল রাত নটায়।

—কাউকে বলেছেন সে-কথা ? ত্রিবেদী কর্নেলকে আর মুখ খুলতেই দিলেন না।

—না। সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। তারপর যখন শুনলাম আজ পুলিশ তদন্ত করতে আসবে, তখন ঠিক করেছিলাম ওই সময় বলব, যা ঘটে ঘটুক।

—আপনার স্যুটকেসে ছিল অ্যাম্পুল দুটো ?

—না। কিটব্যাগেই রাখি। কারণ সব সময় কেউ-না-কেউ এটা ওটা ওষুধ চায়। কার অ্যাসিডিটি, কার মাথাধরা! সব মেডিকেল রিপ্রেজণ্টেটিভই এভাবে ওষুধপত্র সঙ্গে রাখে। খোঁজ নিলে জানাবেন।

—ইঞ্জেকশান সিরিঞ্জ ছিল কি আপনার ব্যাগে ?

দীপ্তেন্দু বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল—বলতে সময় দেবেন তো ? সিরিঞ্জ ছিল। সেও বেপাত্তা হয়ে গেছে।

—শান্তর পোস্টমর্টেম রিপোর্টের খবর শুনেছেন আপনি ?

—শুনেছি। কেন শুনব না ?

—কবে, কখন ?

—কাল বিকেলে হসপিটালের মর্গে গিয়েই শুনেছি। দীপ্তেন্দু উত্তেজিতভাবে বলল। —তো তখনও মাথায় এটা আসেনি। শ্মশান থেকে ফেরার পর রাত্রে হঠাৎ খেয়াল হলো। তখন কিটব্যাগ খুলে দেখি এই অদ্ভুত ব্যাপার। ভেবে দেখলাম, এ কথা পুলিশ ছাড়া

কাউকে বলা উচিত হবে না। পরস্পর সন্দেহ জাগবে। তিক্ততার সৃষ্টি হবে।

ফের ত্রিবেদী কী প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, কর্নেল বললেন—তুমি কখনও সোনার ঠাকুর দেখেছ?

দীপ্তেন্দু তাকাল। তারপর খুব আস্তে বলল সোনার ঠাকুর?

—হ্যাঁ, সোনার ঠাকুর।

—হঠাৎ সোনার ঠাকুর আসছে কেন? দীপ্তেন্দু বিরক্তভাবে পুলিশ অফিসারের দিকে ঘুরল। —এই মার্ডার কেসের ব্যাপারে এমন সাংঘাতিক একটা তথ্য দিলাম। তার সঙ্গে এই উদ্ভট প্রশ্নের সম্পর্ক কী?

ত্রিবেদী একটু হেসে কর্নেলের দিকে তাকালেন। কর্নেল বললেন প্রশ্নের জবাব কিন্তু পাইনি!

দীপ্তেন্দু চটে গেল। —না, সোনার ঠাকুর দেখার সৌভাগ্য এ জীবনে হয়নি।

—ঠিক আছে। আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই।

—তাহলে স্যার, দীপ্তেন্দু পুলিশ অফিসার ত্রিবেদীর দিকে ফের ঘুরে বলল—আমি কিটব্যাগটা এনে দেখাচ্ছি আপনাকে।

ত্রিবেদী খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একদঙ্গল পুলিশের দিকে হাতের ইশারা করলেন। এ এস আই মানিকলাল এগিয়ে এলে বললেন—এঁর সঙ্গে যান। উনি একটা কিটব্যাগ দেবেন। নিয়ে আসুন।

দীপ্তেন্দু উঠল। সে কয়েক পা এগিয়ে গেলে কর্নেল ডাকলেন-আর একটা কথা দীপ্তেন্দু!

দীপ্তেন্দু কর্নেলের দিকে রুষ্ট চোখে তাকিয়ে বলল—বলুন।

—ওষুধটা, মানে যে অ্যাম্প্যুলটা হারিয়েছে, সেটা তোমার কোম্পানি নতুন বের করেছে?

—বললাম তো নতুন। এ মাসেই বাজারে ছাড়া হয়েছে। ফ্রেশ নতুন ওষুধ।

—ঠিক আছে। তুমি অরুণকে পাঠিয়ে দাও।

দীপ্তেন্দু এবং মানিকলাল চলে গেলে ত্রিবেদী গোঁফে হাত বুলিয়ে বললেন—একের পর এক তথ্য বেরিয়ে আসছে। অপারেশন সাকসেসফুল।

কর্নেল হেসে উঠলেন। প্রায় অট্টহাসি।

ত্রিবেদী বললেন—হোয়াটস রং কর্নেল?

—প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের তদন্তে এটা হয়। কর্নেল টুপি খুলে প্রশস্ত টাকে অভ্যাসবশে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন।—জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সবাই সত্য-মিথ্যাকে জড়িয়ে ফেলে। অর্থাৎ পুরো সত্য মুখ থেকে বেরিয়ে আসে না। স্টেটমেন্টগুলোর একেকটা কাঠামো থাকে। কাঠামো বিশ্লেষণ করে সত্য আর মিথ্যা আলাদা করাটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে—এই কেসটার কথাই বলছি, এরা কেউ কেউ নিশ্চয় মিথ্যা বলছে আবার সত্যও বলছে। না—আমি এখনও জানি না, কোনটা ওরা সত্য বলছে বা কোনটা মিথ্যা বলছে। শুধু এটুকু জানি, প্রত্যেকের স্টেটমেন্টের কাঠামোতে সত্য মিথ্যা মেশানো আছে।

ত্রিবেদী সিরিয়াস হয়ে বললেন—স্টেটমেন্ট বলাটা কি ঠিক হচ্ছে? আমরা যা প্রশ্ন করছি, ওরা তার জবাব দিচ্ছে মাত্র। আমাদের প্রশ্নগুলোও ভুল প্রশ্ন হতে পারে। তার মানে, ঠিক প্রশ্ন করলে ঠিক জবাব পেতাম হয়তো। শুধু ব্যতিক্রম দীপ্তেন্দুবাবু। উনি নিজে থেকেই একটা সাংঘাতিক তথ্য দিয়েছেন।

কর্নেল চোখ বুজে একটু হেলান দিয়ে বললেন—আপনি বলছেন অপারেশন সাকসেসফুল?

—অবশ্যই। ঘুরে-ফিরে প্রসূনের কাছেই আমরা পৌঁছুচ্ছি।

—কীভাবে?

—প্রসূনের জানা সম্ভব দীপ্তেন্দুবাবুর কাছে বিষাক্ত ওষুধপত্র থাকে। সে এ-বাড়ির নাড়ী-নক্ষত্র চেনে। আগে থেকে এসে লুকিয়ে ছিল সে। বলে ত্রিবেদী চোখে হাসলেন। —নব তাকে

হেন্ন করেছে। নবকে আমি অ্যারেস্ট করছি। দীপ্তেন্দুবাবুর স্টেটমেণ্ট থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তাঁর ঘর থেকে বিষাক্ত ওষুধ আর ইঞ্জেকশান সিরিঞ্জ চুরি করতে হলে বাড়িরই একজন লোকের সাহায্য জরুরি। নব ছাড়া আর কে হতে পারে সে?

অরুণ আসছিল। কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন। —আপনি ওকে জেরা করুন। আমি আসছি।

বলে ত্রিবেদীকে অবাক করে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন কর্নেল।

## ॥ সাত ॥

দীনগোপাল খাটে বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। চমকে উঠে বললেন—কে ওখানে? তারপর কর্নেলকে দেখে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। কয়েক সেকেণ্ড পরে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বললেন—আসুন।

কর্নেল বললেন—একটু বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম দীনগোপালবাবু!

ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। দীনগোপাল একটু কেশে বললেন—কাল সন্ধ্যায় আপনি আমাকে বললেন শান্তকে ফাঁদে পড়ে প্রাণ দিতে হয়েছে। কথাটা পরে আমার মাথায় এসেছে। আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন। ফাঁদ—হ্যাঁ, ফাঁদ ছাড়া আর কী বলব? আর ওই যে সোনার ঠাকুরের কথটা বলছিলেন, সেটা ··দীনগোপাল ঢোক গিয়ে আত্মসম্বরণ করে বললেন সেটা ঠিক। আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করছি।

—দীনগোপালবাবু, শান্তর ঘরের বালিশের তলায় কাগজে মোড়া সোনার ঠাকুরের কথা আপনাকে নব বলেছিল। তাই না?

দীনগোপাল সোজা হয়ে বসলেন। নব পুলিশকে বলে দিয়েছে? হারামজাদা নেমকহারাম!

—না। কর্নেল একটু হাসলেন। আমার ধারণা। কারণ বিছানাপত্র গোছানোর কাজ নব ছাড়া আপনার বাড়িতে আর কেউ

করার নেই। সে শান্তবাবুর বিছানা গোছাতে গিয়েই দেখতে পায়…

বাধা দিয়ে দীনগোপাল বললেন - হ্যাঁ। নব আমাকে বলেছিল। সেদিনই মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে রাজবাড়ির ঠাকুর চুরির কথা শুনেছিলাম। খুব হইচই পড়েছিল চারদিকে। বাড়ি ফেরার পর নব আমাকে শান্তর বালিশের তলায় কী আছে বলল। গিয়ে দেখি, সর্বনাশ! আমার বাড়িতেই সেই ঠাকুর।

—তখন শান্ত ছিল না বাড়িতে?

—না। আমি হতভাগাকে বাঁচানোর জন্য শুধু নয়, নিজেকে বাঁচানোর জন্যও ওটা সরিয়ে ফেলি। আমার বাড়ি পুলিশ সার্চ করতে পারে বলে আশঙ্কা করেছিলাম। কারণ শান্ত পুলিশের খাতায় দাগী-উগ্রপন্থী! সে তখন আমার বাড়িতে এসেছে। অবস্থাটা চিন্তা করুন!

—নব ছাড়া আর কাউকে কথাটা বলেছিলেন?

—প্রভাতকে বলেছিলাম। দীনগোপাল চাপাস্বরে বললেন। —ওকে ডেকে পাঠিয়ে এ নিয়ে গোপনে আলোচনা করেছিলাম।

—শান্ত চলে যাওয়ার পরে?

হ্যাঁ। তখন প্রভাত থাকত ফিরোজাবাদে ওর এক বন্ধুর বাড়িতে। ভদ্রলোক উকিল। আমার বিষয়-সম্পত্তির মামলামোকর্দমার কাজ করেন।

– কী নাম?

—অভয় মিশ্র। নামকরা উকিল।

—প্রভাতবাবু কী পরামর্শ দিয়েছিলেন?

দীনগোপাল বিরক্ত মুখে বললেন—প্রভাত একটা বদ্ধ পাগল। বলল, আমাকে দাও। রাজমন্দিরে চুপিচুপি রেখে আসি। কিন্তু আমি দিইনি ওকে।

—কেন?

দীনগোপাল অবাক হয়ে বললেন—আপনিও তাই। প্রভাত শুধু পাগল নয়, নির্বোধ! রাজমন্দিরে রাখতে গিয়ে ঠিক ধরা পড়ত।

পুলিশের ধাতানিতে আমাকেও জড়াত। মুখে খালি বড় বড় বুলি! ওকে আমি চিনি না? গবেট—বুদ্ধু—হাঁদারাম! ওর জেল-পালানোর গল্প মিথ্যে। আমি বিশ্বাস করি না।

—আপনি প্রভাতবাবুকে কী বলেছিলেন?

—ওর ওই কথা শুনে রাগ হয়েছিল। বলেছিলাম, থাক। যা করার আমি করব, তুমি যাও।

—আপনি কী করলেন?

—বলব না। সব বলব, এই কথাটা বলব না। সে আপনি যত বড় গোয়েন্দা হোন, ও কথা আমার কাছে আদায় করতে পারবেন না।

—আমি জানি দীনগোপালবাবু, কোথায় সোনার ঠাকুর লুকিয়ে রেখেছেন।

দীনগোপাল তাকালেন। নিষ্পলক দৃষ্টি। একটু পরে বললেন—বলুন।

—অমিও বলব না। কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন।

—গোয়েন্দাদের চালাকি! দীনগোপাল রুষ্টভাবে বললেন। —যদি জানেন, পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছেন না কেন জিনিসটা?

—শান্তর খুনীকে না ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি।

দীনগোপাল রুষ্ট ভঙ্গিতে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বললেন—বেশ। দেখা যাবে।

—নব আপনাকে একটা কালো কুকুরের কথা বলেছিল?

—বলেছিল। ও একটা রামছাগল। সবকিছুতেই ওর সন্দেহ। দীনগোপাল পুবের জানালার দিকে ঘুরে অন্যমনস্কভাবে বললেন।—আপনি আবার এর সঙ্গে একটা 'আড়ালের লোক' যুক্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, আমি নাকি না জেনে এমন কিছু করতে তৈরি হয়েছি, যাতে তার বিপদ হবে। এই তো আপনার থিওরি?

কর্নেল একটু চুপ করে থেকে বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি, 'আড়ালের লোকটা' নেহাত পুতুল। পুতুলনাচ দেখেছেন

তো? পুতুলের আড়ালে একটা মানুষ থাকে। সেই মানুষটা বেশি সাংঘাতিক।

—হেঁয়ালি! চালিয়ে যান।

—দীনগোপালবাবু, আপনি জানেন কি যে দীপেন্দুর ব্যাগ থেকে একটা বিষাক্ত ওষুধের অ্যাম্পুল আর ইঞ্জেকশান সিরিঞ্জ হারিয়ে গেছে? শান্তর বডিতে সেটাই ইঞ্জেক্ট করা হয়েছিল।

দীনগোপাল চমকে উঠলেন।—আমাকে কেউ বলেনি! আশ্চর্য! আর দীপুটাও আহাম্মক, হাঁদারাম! বিষাক্ত ওষুধ-টষুধ সঙ্গে নিয়ে ঘোরে! এরা—এরা সব্বাই গবেট। গাধার গাধা।

—মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভদের সঙ্গে নানারকম ওষুধের স্যাম্পল্ থাকা স্বাভাবিক।

—কোথায় রেখেছিল দীপু?

—খোলা কিটব্যাগে।

দীনগোপাল চঞ্চল হয়ে বললেন—আমি এর মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। সত্যিই শান্তকে ফাঁদে ফেলে মারা হয়েছে। আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমিই এজন্য দায়ী। শান্তকে সোনার ঠাকুর চুরির দায় থেকে বাঁচতে শেষ পর্যন্ত ওর মৃত্যুর উপলক্ষ হলাম। আমিও গবেট। আমারও বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল।

বলে দীনগোপাল বিছানা থেকে নামলেন। ছড়িটি হাতে নিয়ে পা বাড়ালেন।—কৈ? দীপু হতচ্ছাড়াকে একবার দেখি। ওভাবে বিষাক্ত ওষুধ সঙ্গে নিয়ে ঘোরে—বাউণ্ডুলে! এক বচ্ছর নিপাত্তা হয়েছিল পড়াশুনা ছেড়ে। স্রেফ একজামিনেশনের ভয়ে—জানেন? আমার ভাইপোদের কেউই ভাল নয়। সবগুলো বদমাশ! ছিটগ্রস্ত! অভিশপ্ত বংশ মশাই! এমন কী, নীতাও কি কম? জেনেশুনে এক বাঁদরের গলায় মালা দিয়ে এখন ভুগছে। কাল রাত্তিরে বাঁদর ওকেই খুন করতে এসেছিল আসলে।

কর্নেল আগেই বেরিয়েছিলেন বারান্দায়। শান্তর সেই ঘরের সামনে দুজন সেপাই পাহারা দিচ্ছে। কর্নেল ঝটপট একবার

বাইনোকুলারে যতটা দূর দেখা যায়, দেখে নিলেন। দীনগোপাল বললেন—আপনার মশাই এই এক বাতিক! কালো কুকুর, আর...

কথা শেষ না করে করিডরে ঢুকে চেঁচালেন—কৈ? দীপু কোথায়? কোথায় সে বুদ্ধু?

কর্নেল তার পিছু পিছু নেমে নিচে বসার ঘরে গেলেন। দীনগোপালের হাঁকডাক শুনে বাইরের বারান্দা থেকে প্রভাতরঞ্জন, ঝুমা ও নীতা ঘরে এল। ঘিরে ধরল তাঁকে। কর্নেল দেখলেন, কালো রঙের একটা কিটব্যাগ টেবিলে রেখে লনে গণেশ ত্রিবেদী বসে আছেন এবং তাঁর সামনে কাঁচুমাচু মুখে অরুণ খালি দুহাত নাড়ছে। সায়েবি ভঙ্গিতে কাঁধে ঝাঁকুনিও দিচ্ছে। দীপ্তেন্দু বারান্দার নিচেই একা দাঁড়িয়েছিল। কর্নেল নেমে গেলেন। সে দীনগোপালের ডাক শুনেছিল। পাশ কাটিয়ে বারান্দায় উঠল এবং ঘরে ঢুকল।

কর্নেল ত্রিবেদীর কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে বললেন—নবকে অ্যারেস্ট করবেন বলছিলেন। আর দেরি করবেন না। হ্যাঁ—এখনই সোজা লকআপে পাঠিয়ে দিন। শুধু একটা কথা, যেন ওকে মারধর না করা হয়।

ত্রিবেদী ভুরু কুঁচকে তাকালেন এবং ফিক করে হাসলেন।—আই অ্যাম রাইট। ওকে! লালজি! ইধার আইয়ে।

এ এস আই মানিকলাল ছুটে এলেন।—বলিয়ে স্যার!

—অ্যারেস্ট দ্যাট ম্যান, নব। বুঢ়াবাবুকা নোকর!

মানিকলাল দুজন কনস্টেবলসহ বাড়ির দিকে মার্চ করে গেলেন। অরুণ অবাক চোখে তাকিয়ে কথা শুনছিল। বলল—তাহলে নব ব্যাটাচ্ছেলেই...মাই গড! কী সাংঘাতিক কথা!

কর্নেল বসলেন না। বললেন—অরুণ কি সোনার ঠাকুর দেখেছে মিঃ ত্রিবেদী?

অরুণ তখনই দুহাত নেড়ে বলল—নাঃ। অলরেডি আই হ্যাভ টোল্ড হিম দ্যাট! বাট হোয়াই সোনার ঠাকুর? ঠিক এটাই বুঝতে পারছি না। কর্নেল প্রত্যেককে এ কথা জিজ্ঞেস করেছেন

শুনলাম। আমরা মামাবাবুর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

ত্রিবেদী কর্নেলের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে বললেন—আমার কাজ শেষ। আপনি ইচ্ছা করলে প্রশ্ন করতে পারেন অরুণবাবুকে।

কর্নেল বললেন—নাঃ। আমার কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

—দেন ইউ গো! ত্রিবেদী অরুণকে ইশারা করলেন। অরুণ চলে যেতে পারলে বাঁচে, এমন ভঙ্গিতে তড়াক করে উঠে চলে গেল। তারপর ত্রিবেদী বললেন—এই ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কর্নেল, আমি দুঃখিত। সোনার ঠাকুরের কথা আপনি প্রথমে যাকে জিজ্ঞেস করবেন, তাকে চলে যেতে দিলে তো সে অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা করবেই এবং তৈরি হয়েই আসবে। তখনই আমি ভেবেছিলাম আপনাকে বলব, এ পদ্ধতিটা ঠিক নয়। যাকে জেরা করা হবে, জেরা শেষ হলে তাকে তফাতে রাখতে হবে। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আপনার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে বলেই কথাটা তুলিনি। ভাবছিলাম, সম্ভবত আপনার কোনও কৌশল এটা।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। কৌশল। ঠিক, ঠিক। আপনি বুদ্ধিমান।

ত্রিবেদী দেখলেন, কর্নেল চোখে বাইনোকুলার তুলে নিয়েছেন এবং পশ্চিমের অসমতল মাঠের দিকে ঘুরে রয়েছেন। ত্রিবেদী বিরক্ত হয়ে বললেন—কৌশলটা বুঝিয়ে দিলে আমার সুবিধে হতো।

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন—হঠাৎ সোনার ঠাকুরের কথা তুলে আমি কার কী প্রতিক্রিয়া, সেটা যাচাই করতে চাইনি মিঃ ত্রিবেদী! আসলে আমি ওদের জানাতে চেয়েছিলাম, সোনার ঠাকুরের ব্যাপারটা আমি বা আপনি, মানে পুলিশ জানে। অর্থাৎ শান্তর খুনের সঙ্গে একটা সোনার ঠাকুর জড়িত, সেটা আমরা জানি।

—কিন্তু তা ওদের জানিয়ে দেওয়া মানে তো সতর্ক করে দেওয়া!

—হ্যাঁ, সতর্ক করে দেওয়া। ঠিক বলেছেন।

ত্রিবেদী হতাশ ভঙ্গিতে বললেন—মাথায় ঢুকছে না! আপনি বড্ড হেঁয়ালি করেন, কর্নেল!

কর্নেল হাসলেন।—হেঁয়ালি কিসের? ওদের পরোক্ষে সতর্ক করে দিয়েছি, সোনার ঠাকুরের দিকে আর এক পা বাড়ালে বিপদ ঘটবে এবং পুলিশ সব জেনে গেছে।

বলে কর্নেল ঘড়ি দেখলেন। পৌনে দুটো! মাই গুডনেস! আজ আমার স্নান করার দিন! চলি মিঃ ত্রিবেদী!

ত্রিবেদী অবাক এবং গুম হয়ে বসে রইলেন। মানিকলাল নবকে পাকড়াও করে নিয়ে আসছিলেন! পেছনে ক্রুদ্ধ দীনগোপাল তাড়া করে আসছেন। কড়া ধমকের জন্য তৈরি হলেন ত্রিবেদী।...

স্নানাহারের পর রোদে বসে কিছুক্ষণ চুরুট টেনে কর্নেল জলাধারে পাখি দেখায় মন দিয়েছিলেন। এ বেলা আর বেরুনোর ইচ্ছে ছিল না। সেই কেরানী পাখি বা সেক্রেটারি বার্ডটি জলটুঙ্গি থেকে উধাও হয়ে গেছে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তন্নতন্ন খুঁজে ব্যর্থ হলেন।

সবে ঘরে ঢুকেছেন, আলোও জ্বেলে দিয়েছে রামলাল, এমন সময় জিপ এল পুলিশের। পাণ্ডের সাড়া পাওয়া গেল। কর্নেল বললেন—আসুন মিঃ পাণ্ডে!

পাণ্ডের জিপে দুজন সশস্ত্র কনস্টেবলও এসেছে। রামলালের চেনা লোক। রামলাল তাদের সঙ্গে গল্প করতে গেল।

পাণ্ডে ঘরে ঢুকে বললেন—প্রসূন মজুমদার গভীর জলের মাছ। স্যুটকেসের ভেতর জামাকাপড় ছাড়া নাকি আর কিছুই ছিল না। কালো কুকুর ওর স্যুটকেস নিয়ে পালিয়েছে শুনে খুব হাসতে লাগল। কিন্তু কী অদ্ভুত কথাবার্তা শুনুন! বলে কী, ডাকু মঙ্গল সিংয়ের প্রেতাত্মা ওর স্যুটকেসটা হাতিয়েছে।

—কুকুরটা সম্পর্কে কী বলেছে প্রসূন?

—কুকুরটাও প্রেতাত্মা! পাণ্ডে হাসবার চেষ্টা করলেন। —আসল কথা বের করা যেত। সমস্যা হলো, ওর জামাইবাবু সত্যিই সি আই ডি ইন্সপেক্টর অমর চৌধুরী। তিনটের ট্রেনে পৌঁছেছেন।

—অর্থাৎ এ প্রসূন সত্যিই তাঁর শ্যালক?

—সেটাই সমস্যা। শ্যালককে খুব বকাবকি করলেন অবশ্য। নেহাত একটা ট্রেসপাসের পেটি কেস। কী আর করা যাবে? পাণ্ডে গম্ভীর হয়ে গেলেন হঠাৎ। —শ্যালককে নিয়ে মিঃ চৌধুরী আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। আপনার সঙ্গে নাকি ও'র খুব চেনাজানা আছে।

—আছে। বলে কর্নেল ডাকলেন - রামলাল!

বাইরে থেকে সাড়া এল—আভি আতা হ্যায় স্যার!

—দো পেয়ালা কফি, রামলাল!

বলে কর্নেল পাণ্ডের দিকে ঘুরলেন। পাণ্ডে বললেন—এদিকে কেসের অ্যাঙ্গল ঘুরে গেছে। দীনগোপালবাবুর চাকর নবকে ও সি সায়েব অ্যারেস্ট করে লক-আপে ঢুকিয়েছেন।

- জানি।

পাণ্ডে একটু হাসলেন।—কিন্তু এটা কি জানেন, সে নিজেই আগেভাগে কবুল করেছে একটা ডোরাকাটা মাফলার গতকাল জৈন ব্রাদার্সের দোকান থেকে কিনে বসার ঘরের সোফার তলায় লুকিয়ে রেখেছিল?

কর্নেল নড়ে বসলেন। হুঁ! তাই বলেছে নব? কিন্তু কেন এমন করল বলেনি?

বলেছে, মামাবাবুকে বাঁচাতে চেয়েছিল।

—প্রভাতবাবুকে বাঁচাতে চেয়েছিল? কর্নেল কথাটার পুনরাবৃত্তি করে চোখ বুজলেন। একটু পরেই চোখ খুলে ফের বললেন—বাঁচাতে যদি চাইবে, তাহলে কেন নিজে আগেভাগে কথাটা কবুল করল নব? হুঁ বুঝেছি।

পাণ্ডে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন—কী?

—তার মনিব দীনগোপালবাবুর হুকুমেই কাজটা সে করেছিল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

—দীনগোপালবাবু কেন এমন অদ্ভুত হুকুম দেবেন?

-তিনিই প্রভাতবাবুকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন পুলিশের সন্দেহ

থেকে। কারণ শান্তর গলায় লটকানো মাফলারটা প্রভাতবাবুরই। আর, এটা উনি আগাগোড়া জানতেন বলেও মনে হচ্ছে। তবে প্রথম প্রভাতবাবুর মাফলারের ব্যাপারটা নীতারই নাকি চোখে পড়ে। যাই হোক, নব নিজেই কথাটা জানিয়ে দিয়েছে কখন? না তাকে গ্রেফতারের পর। এই পয়েন্টটা গুরুত্বপূর্ণ মিঃ পাণ্ডে।

পাণ্ডে পুলিশ-টুপি খুলে টেবিলে রেখে সহাস্যে বললেন—মগজ ঘেমে যাচ্ছে ক্রমশ। একটু হিম খাইয়ে নিই।...হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। ও সি সায়েবকে বলব'খন।

—দীনগোপালবাবুর বাড়িতে পাহারা কি তুলে নিয়েছেন আপনারা?

—নাঃ। আপনাদের মিঃ চৌধুরী এবার তদন্তে নামবেন। ওঁর অনুরোধ নাকচ করেননি ও সি সায়েব। পাণ্ডে হাসলেন।—ওসব যা হবার হোক। আমার শুধু একটা চিন্তা—দ্যাট ব্লাডি ব্ল্যাক ডগ। কালা কুত্তা! আমার কাজ আমি চালিয়ে যাব। কুকুরটা প্রেতাত্মা হোক, আর যাই হোক, আমি তাকে খতম করবই।

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বললেন—নব কি কিছু আশঙ্কা করেছে?

পাণ্ডে দ্রুত বললেন—কিসের?

—ওর মনিবের কোনও ক্ষতির!

— কে ক্ষতি করবে?

প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে কর্নেল ফের অন্যমনস্কভাবে বললেন—ক্ষতি হওয়ার চান্স ছিল নবর। তাই নবকে নিরাপদে রাখার জন্যই থানার লক-আপে ঢোকাতে পরামর্শ দিয়েছি আমি। নব কিছু জানে, যা বলেনি আমাদের। নিশ্চয় জানে নব। সে রাতে সে ভোর অব্দি জেগে ছিল। কিছু দেখে থাকবে। কিন্তু বলতে চায়নি।

রামলাল কফি নিয়ে ঢুকলে কর্নেল চুপ করলেন। কফির পেয়ালা রেখে সে চলে গেলে কর্নেল আগের মতো আপন মনে বললেন—মঙ্গল সিং ডাকুর ছবি থানায় আছে। কাল গিয়ে দেখব'খন। আমার মনে হচ্ছে, প্রসূন কিছু হিন্ট দিয়েছে।

পাণ্ডে কফিতে চুমুক দিয়ে সকৌতুকে বললেন মংলা ডাকু ওই ড্যামের জলে ভেসে গেছে। তার প্রেতাত্মা দর্শন করেননি তো? ড্যামের ধারেই এই বাংলো! রামলাল কী বলে?

কর্নেল চুপচাপ কফি খেতে থাকলেন। কফি শেষ হলে চুরুট ধরালেন। পাণ্ডে উঠে বললেন—চলি কর্নেল! আশা করি, সকালেই খবর পাবেন কালো কুকুর খতম এবং তার মনিব গ্রেফতার হয়েছে।

—আপনি কি কুকুর খতম অভিযানে বেরিয়েছেন?

—দ্যাটস রাইট। বলে পাণ্ডে মুচকি হেসে বেরিয়ে গেলেন।

জিপের শব্দ মিলিয়ে গেলে কর্নেল বারান্দায় বেরুলেন। পাণ্ডের গাড়ি পশ্চিমে চলেছে। ওই তল্লাটে নৈশ অভিযানে যাচ্ছেন ভগবান-দাস পাণ্ডে। জেদী অফিসার বটে!···

অমর চৌধুরী এবং প্রসূনকে থানার গাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল, তখন রাত প্রায় ন'টা। অমরবাবু বললেন—যেমন আমার গিন্নি, তেমনি তাঁর এই সহোদরটি! সবচেয়ে আশ্চর্য, আমার গিন্নির পেটে পেটে এত দুষ্টুমি ছিল! নীতাকে সোজা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিল? এখানে না আসা অব্দি জানতামই না সে-কথা।

কর্নেল একটু হেসে বললেন—কেয়া দেবীর স্বামী সত্যিকার গোয়েন্দা। আর আমি নেহাতই নকল! আপনাদের মহলে বলে বটে আমাকে 'বুড়ো ঘুঘু'—কিন্তু আমি নিজেই ঘুঘুর সন্ধানে ঘুরে বেড়াই! সরডিহির লাল ঘুঘুর কথা সারা পৃথিবীর ওরনিথোলজিস্টরা জানেন। আমিই জানতাম না। কাজেই কেয়া দেবী আমার উপকার করেছেন। ঘুঘু দেখেছি!

—ফাঁদও দেখলেন। অমরবাবু জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে সিগারেট-পেপার আর তামাকের প্যাকেট বের করলেন। হাতের চেটোয় সিগারেট তৈরি করতে করতে ফের বললেন—অ্যাই পুঁটে! তোর ঘরের অবস্থা দ্যাখ গিয়ে আগে। আর চৌকিদারকে বল্, একটা এক্সট্রা বেড ম্যানেজ করতে পারে নাকি।

প্রসূন গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়। আস্তে বলল—ওটা ডাবল-বেড রুম।

অমরবাবু জোরাল হেসে বললেন—তুইও ফাঁদ পেতে রেখেছিলি? পাখি পড়েনি! পড়বে রে পড়বে! কী বুঝলেন কর্নেল?

কর্নেলও হাসলেন।—পড়ার চান্স ছিল।

—অফ কোর্স! উড়ো পাখি তো নয়, খাঁচা থেকে পালানো পাখি!

প্রসূন রামলালের সঙ্গে কথা বলতে গেল। রামলাল অবাক হয়ে তাকে দেখছিল। একটু পরে প্রসূনের ঘরের তালা খোলার শব্দ শোনা গেল। অমরবাবু বললেন—আমি কাল বিকেলের ট্রেনে কেটে পড়ব। আশা করি, তার আগেই আপনি শান্তর খুনীকে খুঁজে বের করতে পারবেন। সত্যি বলতে কি, সেটা স্বচক্ষে দেখার জন্যই ছুতোনাতা করে থেকে গেলাম। কী? পারবেন না?

কর্নেল একটু পরে আস্তে বললেন—পেরেছি।

অমরবাবু চমকে উঠে তাকালেন।—খুঁজে বের করতে পেরেছেন? কিন্তু তাহলে দেরি করছেন কেন? আরও কোনও বিপদ ঘটতেও তো পারে।

—সোনার ঠাকুরের এপিসোডটি আশা করি শুনেছেন।

অমরবাবু বললেন—শুনেছি। তাহলে আপনি এক ঢিলে দুই পাখি মারবেন মনে হচ্ছে!

কর্নেল হাসলেন।—সেটাই ইচ্ছা। কারণ শান্তর হত্যাকাণ্ড আর সোনার ঠাকুর একসূত্রে বাঁধা।

প্রসূন এল। মুখটা গম্ভীর। একটু তফাতে বসে হাই তুলে বলল—আমি ড্যাম টায়ার্ড। ঘুমও পাচ্ছে। কিন্তু একা ঘরে বড্ড গা ছমছম করছে।

কর্নেল বললেন—মঙ্গল সিংয়ের প্রেতাত্মার ভয়ে?

প্রসূন হাসবার চেষ্টা করল।—হ্যাঁ, মংলা ডাকু অপঘাতে মরেছিল শুনেছি।

—প্রসূন। তুমি ভালই জানো যে মঙ্গল সিং মরেনি।

প্রসূন তাঁর দিকে তাকাল। অমরবাবু চমকে উঠেছিলেন! রুষ্টভাবে বললেন—ওর পেট থেকে কথা বের করা কঠিন। আপনিই হয়তো পারবেন।

—পারব। কারণ অন্যের হাতের তাস দেখার কৌশল আমি জানি।

প্রসূন একটু হাসল। ক্লান্তির ছাপ হাসিতে। বলল বলুন আমার হাতে আর কী তাস আছে?

অমরবাবু বাঁকা মুখে বললেন—একটা আমিও বলতে পারি। ডায়মণ্ড কুইন। রুইতনের বিবি। ইডিয়ট কোথাকার!

কর্নেল বললেন—প্রসূন! মঙ্গল সিং ধোলাইয়ের চোটে লক-আপে আধমরা হয়ে যায়। ওর শক্ত প্রাণ। ড্যামে পুলিশ তাকে ফেলে দিয়েছিল মড়া ভেবে। কিন্তু যেভাবেই হোক, বেঁচে ওঠে। তোমার এবং শান্তর সঙ্গে পরে যোগাযোগ করে। ঠিক বলছি?

প্রসূন গম্ভীর মুখে বলল—আপনি কী করে জানলেন?

—কয়েকটি তথ্য জোড়া দিয়ে এ সিদ্ধান্তে এসেছি। শান্তর খুন হওয়ার খবর আমার মুখে শুনেই তুমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে গেলে। এতে বোঝা যায়, শান্তর সঙ্গে তোমার কোনও গোপন প্ল্যান ছিল। এমন সাংঘাতিক কিছু ঘটে যাবে, তুমি ভাবতেই পারোনি। শান্ত তোমার বন্ধু ছিল। কিন্তু তার খুন-হওয়া শুনে চুপিচুপি দীনগোপালবাবুর বাড়ি ঢুকতে গেলে! এবং ওইভাবে তোমার হঠাৎ এ-বাংলো থেকে ছুটে যাওয়া···প্রসূন! এটা কিছুতেই স্বাভাবিক ঘটনা নয়।

অমরবাবুও জোর দিয়ে বললেন—কখনই নয়। বিশেষ করে নীতার সঙ্গে যখন ডিভোর্সের মামলা ঝুলে আছে, তখন রাত্রে ওদের বাড়ি যাওয়া—এবং চুপিচুপি! মাথার ঠিক ছিল না বলেছিস। ওটা বাজে কথা। শান্ত তোর বন্ধু ছিল। সে খুন হয়েছে। বেশ তো! দিনে যেতে পারতিস, যদিও সে-যাওয়াতে রিস্ক্ ছিল।

কর্নেল বললেন—তোমার উদ্দেশ্য যাই থাক, শান্তর সঙ্গে তোমার গোপন প্ল্যান ছিল। সেই প্ল্যানের সঙ্গে মঙ্গল সিংও জড়িত ছিল।

মঙ্গল সিং তার কালো অ্যালসেশিয়ানের সাহায্যে তোমার স্যুটকেসটি হাতিয়েছে। এতে বোঝা যায়, তোমার আগের নির্দেশ ছিল, যদি তোমারও কোনও বিপদ ঘটে, তোমার স্যুটকেসটা সে যেভাবে পারে, সরিয়ে ফেলে।

প্রসূন বলল—রাতেই সরাতে পারত!

—ছুটি কারনে সেটা হয়নি। প্রথমত, সে তোমার ধরা পড়াব খবর রাতে পায়নি। কারণ আমার ভয়ে সে রাতে এ-তল্লাটে পা বাড়াতে সাহস পায়নি। দ্বিতীয়ত, তোমার ধরা পড়ার খবর সকালের দিকে সে পেয়ে থাকবে। তারপর সে গোপনে এসে এ বাংলোর নিচের দিকে ঝোপঝাড়ে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু রামলালের চোখ এড়িয়ে বাংলোয় ঢোকা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। হ্যাঁ—মঙ্গল সিংয়ের সঙ্গে আমার একটা ছোটখাটো এনকাউণ্টার ঘটেছিল। সেটা বলা দরকার। কেন সে আমাকে ভয় পেয়েছে, বলি।

কর্নেল সেদিন বিকেলের ঘটনাটি সংক্ষেপে বলে তাঁর বিছানার তলা থেকে ভারি ছোরাটি বের করে আনলেন। অমরবাবু সেটি পরীক্ষা করে দেখে বললেন—সর্বনাশ! তাহলে খুব জোর বেঁচে গেছেন আপনি। পুঁটু, তুই গোখরো সাপের সঙ্গে খেলতে গিয়েছিলি, বুঝতে পারছিস! তোকে....তোকে জেলে আটকে রাখাই দরকার।

প্রসূন গুম হয়ে রইল। কর্নেল বললেন—তোমার স্যুটকেসে এমন একটা চিঠির জবাব সেটা।

অমরবাবু ধমক দিলেন।—খুলে না বললেথাপ্পড় খাবি বলে দিচ্ছি!

শান্ত নীতার সঙ্গে আমার মিটমাট করিয়ে দিতে চেয়েছিল—একটা শর্তে।

কর্নেল ভুরু কুঁচকে বললেন—তুমি তাকে সোনার ঠাকুরের খোঁজ দেবে লিখেছিলে।

প্রসূন অবাক চোখে তাকাল। অমরবাবু প্রসূনকে দেখে নিয়ে বললেন—মাই গুডনেস!

কর্নেল বললেন—ছুবছর আগে এখানে হনিমুনে এসেছিলে

তোমার। এক বিকেলে বাইরে থেকে ফিরে দোতলায় দীনগোপালের ঘরের দরজায় নীতার চোখে পড়ে, তার জ্যাঠামশাইয়ের হাতে একটা সোনার ঠাকুর। উনি তখনই লুকিয়ে ফেলেন। নীতার ধারণা, তুমি পেছনে থাকায় ওটা দেখতে পাওনি। কিন্তু তুমিও দেখতে পেয়েছিলে!

প্রসূন মুখ নামিয়ে বলল—হুঁঃ!

—তুমি তারপর নজর রেখেছিলে, দীনগোপাল ওটা কী করেন। এমন কী, ও ঘর থেকে ওটা হাতানোর চেষ্টা করাও সম্ভব তোমার পক্ষে। কারণ তুমি জানতে, ওটা কোন সোনার ঠাকুর এবং শান্তকে ওটার জন্যই লুকিয়ে বেড়াতে হচ্ছে!

প্রসূন চুপ করে রইল। অমরবাবু আবার একটা সিগারেট তৈরিতে মন দিলেন।

কর্নেল বললেন—আমি দৈবজ্ঞ নই। কিছু তথ্য জোড়াতালি দিয়েছি। উপমা দিয়ে বলতে হলে বলব, জোড়াতালি দিয়েছি যে আঠার সাহায্যে, তাকে বলে 'অনুমান'। ন্যায়শাস্ত্রে 'অনুমান' একটা গুরুত্বপূর্ণ টার্ম। যাই হোক, তুমি ওত পেতে থেকে আবিষ্কার করেছিলে সোনার ঠাকুর কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন দীনগোপাল। কিন্তু একজ্যাক্ট স্পটটি তুমি জানতে পারোনি। শুধু এরিয়াটা জানতে পেরেছিলে। এখনও জানো। নীতার সঙ্গে মিটমাট করাতে পারলে শান্তকে তার হদিস দেবে, এমন আভাস ছিল তোমার চিঠিতে।

প্রসূন মাথা দোলাল। বলল—তারপর সম্প্রতি শান্ত আমার সঙ্গে দেখা করেছিল।

—হ্যাঁ, রীতিমতো একটা আবিষ্কার-অভিযানের প্রয়োজন ছিল। এটা প্রথমত, কারও একার পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, এমন আর একজনের সাহায্যের দরকার ছিল, যে সেই এলাকার নাড়ী নক্ষত্র চেনে। কিন্তু এক্ষেত্রে অন্য কাউকে দলে টানার প্রচণ্ড ঝুঁকি ছিল। অতএব মঙ্গল সিং এই ছকে চমৎকার ফিট করে যাচ্ছে। সে বিশেষ করে সোনার ঠাকুর চুরি বা ডাকাতির সঙ্গে পরোক্ষ জড়িত ছিল।

কারণ সে পুলিশকে বলেছিল, ঠাকুর চুরি হবে সে জানত। পরিকল্পিত অভিযানে তার উৎসাহ বেশি হওয়ারই কথা।

প্রসূন একটু কেশে নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল – আপনি ঠিক বলছেন। কিন্তু শান্ত...

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন—তার আগের প্রশ্ন, তুমি শান্তর হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়েই ও-বাড়ি দৌড়ে গেলে কেন? কেন চুপিচুপি হানা দিতে চেষ্টা করলে?

—শান্তর কাছে...

—আমি বলছি। শান্তর কাছে তোমার সেই চিঠিটা ছিল। তাই কি?

—হ্যাঁ।

—শান্তর খুন হওয়ার খবর শুনেই তুমি চিঠিটা উদ্ধার করতে গেলে এবং বোকার মতো ধরা পড়লে।

—মাথার ঠিক ছিল না।

অমরবাবু ভেংচি কেটে বললেন—মাথার ঠিক ছিল না! পুলিশকে এ কথাটাই বলেছে, জানেন তো কর্নেল? একের নম্বর বোকা!

কর্নেল বললেন—প্ল্যানিং মতো ডাকু মঙ্গল সিং দীনগোপালকে আনাচে-কানাচে থেকে ভয় দেখাতে শুরু করে। কী প্রসূন?

প্রসূন বলল—ওটা একটা নেহাত চেষ্টা যদি একজ্যাক্ট স্পট লোকেট করা সম্ভব হয়। মানে জ্যাঠামশাই ভয় পেয়ে মূর্তিটা অন্য কোথাও লুকিয়ে ফেলতে পারেন ভেবেছিলাম। মঙ্গল সিং ওঁকে ফলো করে বেড়াচ্ছিল সেজন্য। কিন্তু ভদ্রলোক শক্ত মানুষ। তাছাড়া তিনি জানেন, তাঁকে মেরে ফেললে আর জিনিসটা উদ্ধার করাই যাবে না।

—ঠিক। আমিও দীনগোপালবাবুকে সামনাসামনি এ কথা বলেছি। অমরবাবু বললেন—কিন্তু বাসস্টপের লোকটা কে? পুঁটু বলছে, সে নয় এবং এটা তার কাছে রহস্যময় মনে হয়েছে। কীরে? বল্ কথাটা!

প্রসূন আস্তে বলল—সত্যিই জানি না কে সে? শুধু একটা খটকা লাগছে, সে যেই হোক, আমাদের তিনজনের প্ল্যানিংয়ের কথা জানতে পেরেই কি এভাবে ফাঁদ পেতেছিল?

কর্নেল বললেন—কারেক্ট। তুমি ঠিকই সন্দেহ করেছ। ফাঁদ।

অমরবাবু বললেন—ফাঁদ মানেটা কী?

—শান্তকে খুনের মোটিভ এবার খুব স্পষ্ট ধরা পড়ছে বলেই ফাঁদটাও সাব্যস্ত হচ্ছে।

—কী মোটিভ?

—আপনি পুলিশ ডিটেকটিভ। আপনি ভাল জানেন, সব ডেলিবারেট মার্ডারে দুটো মোটিভ থাকে। পার্সোনাল গেইন আর প্রতিহিংসা। এখানে পার্সোনাল গেইন একটা ফ্যাক্টর। খুনী যেভাবে হোক জানতে পেরেছিল—প্রসূন ঠিকই বলেছে। সে জেনেছিল সোনার ঠাকুর সংক্রান্ত কিছু গোপন তথ্য শান্তর কাছে আছে! সেটা প্রসূনের চিঠিটাই বটে। ওটা হাতাতে সে শান্তকে খুন করেছে। ভেবেছে, ওতে নিশ্চয় একজ্যাক্ট্ স্পট্—মানে ঠাকুর কোথায় লুকানো আছে, সেটা জানা যাবে।

প্রসূন বলল—তাহলে সে ঠকেছে।

হ্যাঁ, ঠকেছে তো বটেই। কর্নেল বললেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শান্ত বেঁচে নেই। তাই জানা যাচ্ছে না, কিভাবে চিঠিটা বা প্ল্যানিংয়ের কথা সে জানতে পারল। শান্ত কি তারও সাহায্য চেয়েছিল?

প্রসূন বলল—কথাটা আমিও ভেবেছি। শান্ত আরও কাউকে দলে নিতে গিয়েই বিপদ বাধিয়েছে।

—শান্ত বিয়ে করেছিল সম্প্রতি?

—বিয়ে? প্রসূন একটু হাসল।—নাঃ। ওটা ওর জোক। মাঝে মাঝে বিয়ে করেছে বলে জোক করত।

—তোমার সঙ্গে কি শান্তর কখনও বিপদ হয়েছিল?

—কে বলল?

—হয়েছিল কিনা?

—হ্যাঁ। সেজন্যই চিঠি লিখেছিলাম। নৈলে ত মুখোমুখি....

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন—কী নিয়ে বিবাদ?

—রাজনৈতিক বিবাদ। নেহাত মতাদর্শগত ব্যাপার। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?

—ঝুমা বলেছে।

—ঝুমার সঙ্গে শান্তর একটা সম্পর্ক মিল। কিন্তু শান্ত বিয়েতে রাজী হয়নি। পরে ঝুমা অরুণকে বিয়ে করে। শান্তর ওপর ঝাল ঝাড়তেই শান্তর এক জ্যাঠতুতো ভাইকে ধরে ঝুলে পড়েছিল। আমি ওকে পছন্দ করি না।

—কিন্তু নীতা বলেছে শান্তর সঙ্গে তোমার কোনও বিবাদ ছিল না।

প্রসূন হাই তুলে বলল—নীতার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে তার অনেক পরে। কাজে সে জানে না।

কর্নেল চুরুট বের করে বললেন – বাসস্টপের লোকটা ··

—আমি নই। প্রসূন ঝটপট বলল। তারপর উঠে দাঁড়াল।—ক্ষমা করবেন কর্নেল! ঘণ্টা পর ঘণ্টা জেরায় জেরবার হয়ে এসে আবার আপনার জেরা। আমার ঘুম পাচ্ছে।

বলে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অমরবাবু আস্তে বললেন—গোঁয়ার! ওকে বাগ মানানো কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আর, পেটে-পেটে বুদ্ধি! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পুঁটু জানে শান্তকে কে খুন করেছে।

কর্নেল চুরুট জ্বেলে বললেন—আপনারা আশা করি ডিনার খেয়ে এসেছেন?

—হ্যাঁ। আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। প্রায় দশটা! আপনি খাওয়া সেরে নিন।

রামলাল অপেক্ষা করছিল। কর্নেলের কথায় টেবিলে রাতের খাদ্য এনে রাখল। কর্নেল চুপচাপ চুরুট টানছিলেন। চোখ বন্ধ। অমরবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন—তাহলে আমি উঠি কর্নেল!

কর্নেল চোখ খুলে একটু হেসে বললেন—অন্যের সামনে অনেকে আহার করা পছন্দ করেন না। আমি সে-দলে নই। যাই হোক, আপনি আপনার শ্যালকের কান বাঁচিয়ে কিছু বলতে চান, সেটা বুঝতে পেরেছি। এবার স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।

অমরবাবু চাপাস্বরে বললেন—আমার মনে হচ্ছে, আজ রাত্রে আবার একটা বিভ্রাট বাধাবে পুঁটু। আমি একটু ঘুমকাতুরে মানুষ। আমার ভয় হচ্ছে, কখন চুপিচুপি বেরিয়ে গিয়ে ফের ও-বাড়ি ঢোকার চেষ্টা না করে। কর্নেল, আমার শ্যালকটিকে মোটেও নিরীহ ভাববেন না। ওর অসাধ্য কিছু নেই। আপনি প্লিজ একটা কাজ করবেন। আপনার দরজার তালাটা আমাদের ঘরের দরজায় চুপি-চুপি আটকে দেবেন।

কর্নেল চুরুট ঘষটে নিভিয়ে বললেন— আপনি না বললেও তাই করতাম।

অমরবাবু কী বলতে যাচ্ছেন, হঠাৎ বারান্দায় প্রসূনের গলা শোনা গেল। —বাঃ! জিও মঙ্গল সিং! বহুত আচ্ছা কাম কিয়া তুমনে!

অমরবাবু দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। তারপর গেলেন কর্নেল। বারান্দায় একটা স্যুটকেস হাতে দাঁড়িয়ে আছে প্রসূন। উজ্জ্বল মুখে বলল—দরজার কাছে রেখে গেছে কাল্লু। কাল্লুকে এক কেজি মাংস খাওয়াব। আর তার মনিব—মাই গুড ফ্রেণ্ড মঙ্গল সিংকে বখশিস দেব এক বোতল রঙ্গিয়া। রঙ্গিয়া কি জানেন কর্নেল? সরডিহি এরিয়ার দ্যা বেস্ট্ মহুয়া। দ্যা কুইন অফ দ্যা মহুয়াজ্!...

## ॥ আট ॥

দীনগোপাল গেট থেকে নিচের রাস্তায় নেমেছেন, ঝোপের আড়াল থেকে কর্নেল বেরিয়ে বললেন—গুড মর্নিং দীনগোপালবাবু!

দীনগোপাল চমকে উঠেছিলেন। বললেন—ও! ডিটেকটিভ মশাই!

—মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছেন? কর্নেল সহাস্যে বললেন—আমারও একই অভ্যাস। চলুন, গপ্প করতে করতে যাই!

—গপ্পের মেজাজ নেই। তাছাড়া আমি একা বেড়ানোই পছন্দ করি।

দীনগোপাল স্থির দাঁড়িয়ে গেছেন। কর্নেল বললেন—ওই টিলার পিপুল গাছের তলার বেদীতে কী আছে দীনগোপালবাবু যে, রোজ ভোরে একবার করে গিয়ে দেখে আসেন? নিশ্চয় ঈশ্বরচিন্তায় মনোনিবেশ করতে যান না! আপনি তো নাস্তিক!

দীনগোপাল আস্তে বললেন—আপনি কী বলতে চান?

—এভাবে দাঁড়িয়ে আমরা বিতর্ক বাধালে লোক জড়ো হবে। এবার কর্নেল অমায়িক কণ্ঠস্বরে বললেন। —চলুন না, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।

দীনগোপাল তবু দাঁড়িয়ে রইলেন।

কর্নেল বললেন—নবকে গোপনে একটা মাফলার কিনে আনতে বলেছিলেন কেন দীনগোপালবাবু?

—আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন কিন্তু!

—নব পুলিশকে নিজেই আগ বাড়িয়ে বলেছে, সে অবিকল প্রভাতবাবুর মাফলারটার মতো একটা মাফলার কিনে সোফার তলায় লুকিয়ে রেখেছিল। নবর কৈফিয়ত হলো, সে প্রভাতবাবুকে পুলিশের সন্দেহ থেকে বাঁচাতে এ কাজ করেছে। এখন কথা হলো, নবর এ গরজ কেন? এক হতে পারে, সে প্রভাতবাবুর সঙ্গে কোনও চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। কিন্তু এটা তার চরিত্রের সঙ্গে মানায় না। সে অসৎ লোক হলে শান্তর বালিশের তলায় লুকনো সোনার ঠাকুর নিজেই হাতাত। তা সে করেনি। আপনাকে দিয়েছিল। কাজেই এটা স্পষ্ট যে সে তার মনিবের হুকুমেই মাফলারটা কিনে নিয়ে গিয়ে···

—আপনি থামুন। বলে দীনগোপাল পা বাড়ালেন।

কর্নেল তাঁকে অনুসরণ করে বললেন—দীনগোপালবাবু, নব আগ বাড়িয়ে নিজেই মাফলার কেনার দায় নিজের ঘাড়ে নিয়েছে। কারণ

তার আশঙ্কা, আপনার কোনও বিপদ ঘটতে পারে--যেহেতু সে আপনার বাড়িতে আর নেই, থানার লক-আপে বন্দী। নব খুব বুদ্ধিমান। সে একটা আভাস দিয়েছে।

দীনগোপাল ঘুরে বললেন—আমার বিপদ হবে না।

—দীনগোপালবাবু! আপনি কেন প্রভাতবাবুকে পুলিশের সন্দেহ থেকে বাঁচাতে চেয়েছেন ?

—বলব না।

—প্রভাতবাবুর গলার ডোরাকাটা মাফলার ফাঁস করে শান্তর বডি কড়িকাঠে লটকানো হয়েছিল। কাজেই প্রভাতবাবুর প্রতি পুলিশের সন্দেহ স্বাভাবিক। আমারও সন্দেহ স্বাভাবিক। সেই সন্দেহ সত্যে পরিণত হয়েছে। পাইপ পরীক্ষার সময় উনি ইচ্ছে করেই আমাদের সামনে মরচে-ধরা পাইপ গুঁড়ো করার ছলে হাতে রক্তপাত ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু একটা হাতে। অথচ আপনার ঘরে গিয়ে দেখেছি ওঁর দুহাতের আঙুলে ব্যাণ্ডেজ। তার মানে, উনিই ভাঙা জানালার পাইপ বেয়ে নেমে গিয়েছিলেন। একটা হাতের আঙুল কেটে রক্ত পড়েছিল। সেটা গোপন করার সুযোগ ছাড়েননি। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তাড়াহুড়োর দরুন অন্য হাতের আঙুলের রক্ত ঝরালেন। তার মানে, প্রভাতবাবুই শান্তকে নিজের মাফলারে কড়িকাঠে ঝোলান। আত্মহত্যার কেস সাজানো।

দীনগোপাল নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে শুনছিলেন। গলার ভেতর বললেন—কী অদ্ভুত কথা! প্রভাত আমাকে কাল বলল, সে নিচের ঘরে সোফায় ঘুমিয়ে থাকার সময় তার গলার মাফলার চুরি করেছে শান্তর খুনী।

কর্নেল তার কথার ওপর বললেন—না। তা সত্য নয়।

দীনগোপাল চটে গেলেন। —কী বাজে কথা বলছেন! ভোর ছটায় মর্নিং ওয়াকে বেরুনোর সময় আমি ওর হাতের কাছ থেকে বল্লমটা নিয়ে গিয়ে লনে পুঁতে দিয়েছিলাম। ও টেরই পায়নি। কাজেই ওর গলা থেকে মাফলার খুলে শান্তকে মেরে কড়িকাঠে লটকে ওকেই

কি দায়ী করার কারসাজি নয় খুনীর? প্রভাতের ঘুম মানে মড়া। তার প্রমাণ আমিও হাতে-নাতে পেয়েছিলাম। কাজেই প্রভাত যখন গতকাল আমাকে বলল, তার মাফলার হারিয়েছে এবং সেটাই খুনী শান্তর গলায় বেঁধে ছিল, তখন তাকে বাঁচানো আমার কর্তব্য মনে হয়েছিল।

—গতকাল সকালে নীতার চোখে পড়ে প্রভাতবাবুর মাফলার নেই এবং সেটা ডোরাকাটা মাফলার।

— হ্যাঁ। প্রভাত বলল, মাফলারের কথা তার খেয়ালই ছিল না! আমি জানি প্রভাতের বড্ড ভুলো মন।

—প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা নিজের মাফলারের কথা ভুলে থাকা! শান্তর গলায় একইরকম মাফলার দেখেও সন্দেহ না জাগা! আপনিই বলুন দীনগোপালবাবু, এ কি বিশ্বাসযোগ্যে?

দীনগোপাল আড়ষ্টভাবে বললেন—কিন্তু আমি ওর হাতের কাছ থেকে বল্লমটা নিলেও ও টের পায়নি। কাজেই ওর কথা বিশ্বাস করেছিলাম।

কর্নেল একটু হাসলেন। —প্রভাতবাবু ঠিকই টের পেয়েছিলেন। সবটাই ওঁর অভিনয়। মাফলারের ব্যাপারটা ওঁর প্রতি সন্দেহ জাগাবে জানতেন, তাই ঘুমের ভান করে পড়ে ছিলেন।

দীনগোপাল চঞ্চল হয়ে উঠলেন।—আমি কিছু বুঝতে পারছি না। প্রভাত কেন নিজের গলার মাফলারে শান্তকে লটকে আত্মহত্যার কেস সাজাল? ও নির্বোধ। কিন্তু এত বেশি নির্বোধ?

—তাড়াহুড়ো করা ওঁর স্বভাব। ভাবেননি কী করছেন। পরে যখন বুঝেছিলেন, ভুল করে ফেলেছেন, তখন আর উপায় নেই। শান্তর ঘরের দরজা ভেতর থেকে নিজেই বন্ধ করে পাইপ বেয়ে নেমে গেছেন। পাইপের অবস্থাও বুঝেছেন। পাইপ বেয়ে আবার উঠে যাওয়ার রিস্ক্ ছিল। নিজের মাফলার ব্যবহারে ওঁর হঠকারী নাটুকে চরিত্রের পরিচয় মেলে।

—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, প্রভাত কেন শান্তকে খুন করবে?

দীনগোপাল দৃঢ়কণ্ঠে বললেন। —আপনার বুদ্ধি আছে। কিন্তু আপনি নিশ্চই কোথাও ভুল করছেন।

—না দীনগোপালবাবু!

দীনগোপাল খাপ্পা হয়ে বললেন—প্রভাত খুনী?

—তাঁকে আমি খুনী বলেছি কি? তবে তিনিই আত্মহত্যার কেস সাজিয়েছিলেন।

—হেঁয়ালি! খালি প্যাঁচালো কথাবার্তা।

—হেঁয়ালী নয়, দীনগোপালবাবু! প্রভাতবাবু খুনীকে বাঁচাতে এ কাজ করেছিলেন। তার মানে, তিনি জানেন খুনী কে!

—আমার মেজাজ খারাপ করে দিলেন! দীনগোপাল পা বাড়িয়ে বললেন। —এখনই গিয়ে প্রভাতকে চার্জ করছি।

—না, না! এ ভুল করবেন না, আমার প্ল্যান ভেস্তে যাবে।

—কী আপনার প্ল্যান?

—আজ রাত্রে, ধরুন নটা নাগাদ আপনি ওই টিলার মাথায় পিপুলতলার বেদীটার কাছে চুপিচুপি যাবেন। খুনীর জন্য আমি একটা ফাঁদ পাততে চাইছি, দীনগোপালবাবু! আপনার সহযোগিতা চাই।

দীনগোপাল ঢোক গিলে বললেন—ওখানে কেন?

কর্নেল হাসলেন। —ওখানেই আপনি কোথাও সোনার ঠাকুর লুকিয়ে রেখেছেন, খুনীর বিশ্বাস।

দীনগোপাল মুখ নামিয়ে গলার ভেতর বললেন—সে কেমন করে জানবে?

—এই জানাজানিটা রিলে-পদ্ধতিতে হয়েছে।

—ফের হেঁয়ালি করছেন?

—প্রসূন হনিমুনে এসে সোনার ঠাকুরের কথা জানতে পেরেছিল। সে আপনাকে ফলো করেছিল। কিন্তু সঠিক জায়গাটি জানতে পারেনি। তবে টিলাটির কোথাও আপনি ঠাকুর লুকিয়ে রাখেন, এটুকু তার জানা। এর পর নীতার সঙ্গে মিটমাটের জন্য সে শান্তর

সাহায্য চায়। শান্তকে সে হারানো ঠাকুর উদ্ধারেরব্যাপারে সাহায্য করতেও চায়। যাই হোক, শান্ত বেঁচে নেই। শান্তর কাছ থেকেই তার খুনী জানতে পারে একটা হাফ কিলোগ্রাম ওজনের নিরেট সোনার ঠাকুরের কথা। খুনী ভেবেছিল, শান্তকে মেরে ওটা হাতাবে। শান্তর কাছে প্রসূনের চিঠিতে আভাসে লেখা ছিল কোন এরিয়ায় ওটা লুকিয়ে রেখেছেন আপনি। কিন্তু খুনী ভেবেছিল, চিঠিটাতে 'একজ্যাক্ট্ স্পট্ লোকেট' করা আছে। তাই শান্তকে খুন করে তার জিনিসপত্র হাতড়ে একাকার করে সে। তার পোশাক তন্নতন্ন খোঁজে। না পেয়ে মাফলারটার দিকে চোখ পড়ে। হ্যাঁ, দীনগোপালবাবু! সাবধানতাবশে মাফলারটার ভেতর শান্ত প্রসূনের চিঠি এবং এরিয়ার ম্যাপ এঁকে লুকিয়ে রেখেছিল। ওতে হাত দিয়েই খুনী লুকোন কাগজ টের পায়। এক ঝটকায় ওটা ব্র্যাকেট থেকে তুলে নেয়। সোয়েটারের ভেতর লুকিয়ে ফেলে। কিন্তু পরে মাফলার ছিঁড়ে কাগজগুলো বের করে সে বুঝতে পারে, ঠকে গেছে। ওতে হিন্ট আছে মাত্র।

দীনগোপাল অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন—এমনভাবে বলছেন যেন আপনিও তখন ও-ঘরে ছিলেন!

কর্নেল হাসলেন। —তথ্য জোড়াতালি দিয়ে জেনেছি। ঘটনার দিন সকালে আমি পশ্চিমের মাঠে শান্তর মাফলারটা পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। মাফলারটা ছেঁড়া ছিল। মাঠে ছেঁড়াখোঁড়া মাফলার পড়ে থাকা নিয়ে আমার মাথাব্যথার কারণ ছিল না। তাছাড়া তখনও জানতাম না আপনার বাড়িতে কি ঘটেছে।

দীনগোপাল চার্জ করার ভঙ্গিতে বললেন—এত যখন জানেন, তখন আপনিও জানেন খুনী কে। কিন্তু তাকে ধরিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

—খুনীকে ধরার আগে একটু খেলা করা আমার চিরাচরিত স্বভাব দীনগোপালবাবু! সত্যি বলতে কী, মাঝে মাঝে এই যে শৌখিন গোয়েন্দাগিরি করে থাকি, সেটা আমার একধরনের প্রমোদ। তাস নিয়ে পেসেন্স্ খেলা!

—আপনি আমাকে 'লাস্ট কার্ড' হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন দীনগোপাল রুষ্ট হয়ে বললেন। —আমি আপনার তুরুপের তাস!

—ব্যাপারটা এভাবে নেবেন না প্লিজ! কর্নেল অমায়িক কণ্ঠস্বরে বললেন। আমি আপনার সাহায্য চাইছি শুধু।

—ঠিক আছে। কিন্তু প্রভাত সব জেনেও চুপ করে আছে কেন? ও কোনও কথা আমাকে গোপন করে না। এমন সাংঘাতিক কথা আমাকে জানাল না? কেন?

কর্নেল হাসলেন।—আমার অনুমান আছে কিছু, হাতে তথ্য নেই। থাকলে জোর দিয়ে বলতে পারতাম কেন এমন করে চেপে রেখেছেন উনি।

—অনুমানটাই শোনা যাক।

—পরশু রাত্রে ভোর চারটে থেকে ছটার মধ্যে শান্তবাবু খুন হয়েছেন। প্রভাতবাবু ভোর চারটেতে তাঁর বাহিনী ডিসপার্স করে সোফায় শুয়ে পড়েন। কেমন তো?

—হ্যাঁ। তাই শুনেছি।

—তারপর উনি যে-ভাবেই হোক জানতে পারেন, ওপরে কিছু ঘটছে। আপনার বাড়িটা পুরনো। ওপরতলায় কিছু সন্দেহজনক শব্দ হলে নিচের তলা থেকে শোনা খুবই সম্ভব। তাছাড়া প্রভাতবাবু নাটুকে চরিত্রের এবং হটকারী স্বভাবের মানুষ।

—ঠিক ধরেছেন। সেজন্যই রাজনীতি করে কিছু বরাতে জোটাতে পারেনি।

—প্রভাতবাবু ওপরে গিয়েই খুনীকে দেখতে পান। খুনী এমন লোক, তাকে দেখেই হতবাক হয়ে পড়েন। সেই সুযোগে খুনী তার হাতে-পায়ে ধরে হোক, অথবা···

—অথবা কী? দীনগোপাল মারমুখী হয়ে প্রশ্নটা করলেন।

—প্রভাতবাবুর আর্থিক অবস্থা হয়তো ভাল নয়।

—মোটেও নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনসন জুটিয়েছিল, তাই রক্ষা। নৈলে না খেয়ে মরত।

—তাহলে বলব, দুটোই তাঁকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল। একটা হলো, খুনীর অনুনয়-বিনয়—খুনী তাঁর স্নেহভাজনও বটে। দ্বিতীয়ত, সে তাঁকে সোনার ঠাকুরের ভাগ দিতে চেয়েছিল। আমার ধারণা, এই দুটো কারণেই প্রভাতবাবু তাকে বাঁচাতে তাড়াহুড়ো করে আত্মহত্যার কেস সাজান। কিন্তু তারপর নিজের বোকামি টের পান, যখন নীতা তাঁকে মাফলারের কথাটা বলে। তিনি বুঝতে পারেন, ব্যাপারটা আর চাপা থাকবে না।

—আপনার অনুমানে যুক্তি আছে বটে!

—এতে খুনীর হাতে ব্ল্যাকমেল্‌ড্ হওয়ার ঝুঁকিও টের পান প্রভাতবাবু। খুনী তাঁকে সম্ভবত তারপর আড়ালে শাসিয়েও থাকবে। মাফলারটা প্রভাতবাবুকে আইনত খুনী সাব্যস্ত করে কিনা, বলুন? ফলে প্রভাতবাবু আরও ভয় পেয়ে আপনার শরণাপন্ন হন। একটা ডোরাকাটা মাফলার আপনার সাহায্যে যোগাড় করেন। এও প্রভাতবাবুর হঠকারিতা!

দীনগোপাল আবার রুষ্ট হয়ে বললেন- কিন্তু নবটার কী আক্কেল! নব কেন আগ বাড়িয়ে পুলিশকে কথাটা বলতে গেল?

—নব আপনার বিপদের আশঙ্কা করে প্রভাতবাবুকে ধরিয়ে দিতে চেয়েছে। কারণ সে সোনার ঠাকুরের ঘটনাটা জানে। তাছাড়া এমন কিছু সে দেখেছিল, যা এখনও কবুল করেনি পুলিশকে। কিন্তু ওই জানাটুকু তার পক্ষেও বিপজ্জনক। খুনী জানে যে নব তাকে ওপরে উঠতে এবং নিচে নামতে দেখেছে।

—তাহলে প্রভাতকেও ওপরে উঠতে এবং নিচে নামতে দেখেছিল নব?

—আমার তাই ধারণা। কর্নেল গম্ভীর হয়ে বললেন।—এই ধারণার ফলে আমিই তার নিরাপত্তার জন্য পুলিশের হেফাজতে তাকে সরিয়ে রেখেছি।

দীনগোপাল ফোঁস শব্দে শ্বাস ছেড়ে বললেন—সোনার ঠাকুর এমন সর্বনাশ ঘটাবে ভাবতে পারিনি। আমি নাস্তিক। আমি ঠাকুর-

ভগবান-দৈবে বিশ্বাসী নই। আমার কাছে ওটা নেহাত একটা সোনার পিণ্ডমাত্র। আমার ইচ্ছা ছিল, শীগগির ওটা ফিরোজাবাদে আমার অ্যাটর্নি মিশ্রবাবুর সাহায্যে গোপনে বিক্রি করব এবং সেই টাকায় একটা অনাথ আশ্রম খুলব। সরডিহির রাজফ্যামিলি গরীব প্রজাদের রক্ত চুষে সেই টাকায় সোনার ঠাকুর বানিয়ে পুজো করত! আপনি জানেন, কেন আমি এতগুলো সুফলা জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলাম? ওই রাজাদের অত্যাচারে। ওরা আসলে জমিদার, খেতাবে লেখে রাজা না গজা! আমি ওদের ফ্যামিলিকে ঘৃণা করি। ওদের সঙ্গে আমি মামলা লড়ে ফতুর হয়েছি! কাজেই শান্ত ওদের সোনার ঠাকুর চুরি করেছে দেখে আমি খুশি হয়েছিলাম। শান্তর চুরি করা ঠাকুর আমি লুকিয়ে ফেলেছিলাম—সেটা নিছক শান্তর বিপদের কথা ভেবেই নয়। খুলেই বলছি, প্রতিশোধের প্রবৃত্তিবশেও বটে!

কর্নেল দেখলেন, দীনগোপালের মুখ ঘৃণায় বিকৃত। কর্নেল আস্তে বললেন—বুঝতে পারছি।

দীনগোপাল বললেন—ঠিক আছে। একটা শর্তে আপনাকে সাহায্য করব। ফাঁদ পেতে খুনীকে ধরুন। কিন্তু স্পষ্ট বলছি, আমি সোনার ঠাকুর কাউকে দেব না। আমি ভান করব, যেন সত্যি ওটা খুঁড়ে বের করছি। এই শর্ত। ওটা সময়মতো গোপনে বের করে যা প্ল্যান আছে, করব।

বলে দীনগোপাল রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেন। পশ্চিমদিকে গতি। কর্নেল উল্টোদিকে চললেন। সরডিহি থানার সেকেণ্ড অফিসার ভগবানদাস পাণ্ডের কুকুরনিধন অভিযানের ফলাফল জানতেই।...

লাঞ্চের পর অমরবাবু এবং কর্নেল রোদে বসে গল্প করছিলেন। একসময় অমরবাবু চাপা স্বরে বলে উঠলেন—আমি বোধহয় একটা ভুল করছি, কর্নেল!

কর্নেল চোখ বুজে চুরুটে টান দিয়ে বললেন—কী ভুল?

—পুঁটুকে একলা হতে দিচ্ছি না। ওর ফাঁদে পাখিটা এসে পড়ছে না। দূর থেকে ঘুরে যাচ্ছে। ওই দেখুন!

কর্নেল চোখ খুললেন। তারপর বাইনোকুলারে চোখ রাখলেন অমরবাবুর নির্দেশ অনুসারে। বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন—হুঁ। সেচ খালের ধারে নীতা একা দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক আছে! চলুন, আমরা কিছুক্ষণ বাইরে কোথাও ঘুরে আসি।

অমরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন—পুঁটে!

ঘরের ভেতর থেকে সাড়া এল। —পুঁটে-ফুটে বলে কোনও প্রাণী নেই পৃথিবীতে।

ইস! অভিমানের বহর দেখো! অমরবাবু অট্টহাসি হাসলেন।—শোন্ বেরুচ্ছি আমরা। ফিরে এসে যদি শুনি, বেরিয়েছিলে—কোথাও ফের হাজতে ঢোকাব। সাবধান!

প্রসূন বেরিয়ে এল।—আমাকে একা ফেলে যাওয়া ঠিক হচ্ছে কি? আমরা যদি কোনও বিপদ হয়?

—রামলাল আছে। ডাকবি।

প্রসূন নেমে এসে রোদে বেতের চেয়ারে বসল। বলল—রামলাল আমাকে বাঁচাতে পারবে না। মঙ্গল সিং ছিল। তাকে ওই পাগুে ভদ্রলোক নাকি তাড়া করে ভাগিয়ে দিয়েছেন এরিয়া থেকে তাই না রামলাল?

রামলাল ঘাসে বসে রোদ পোহাচ্ছিল। বলল—আজিব বাত স্যার! বাজারমে শুনা, মংলু ডাকু জিন্দা হ্যায়। ইয়ে ক্যায়সে হো শকতা, মুঝে তো মালুম নেহি। পুলিশ ভুল দেখা জরুর!

রাস্তায় পৌঁছে অমরবাবু বললেন—পাখি আমাদের দেখছে! ঘুঘু পাখির সঙ্গে প্রেমিকার উপমা অবশ্য জুতসই হবে না। তবে এক্ষেত্রে ব্যাপারটা তাই দাঁড়াচ্ছে।

কর্নেল হাসলেন।—চলুন! আপনাকে বরং লাল ঘুঘু দেখাব। বিরল প্রজাতির ঘুঘু! তবে যথার্থ ঘুঘু।

বলে কর্নেল ঘুঘু পাখির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। পায়রা আর ঘুঘুর মধ্যে কী কী পার্থক্য, ওরা সত্যিই কাঁকর খায় কিনা, ভিটেয় ঘুঘু-চরানো কথাটার উৎপত্তি কী সূত্রে—এই সব বিষয়ে বিশদ বিবরণ। অমরবাবু মন দিয়ে শোনার ভান করছিলেন। কিন্তু দৃষ্টি ক্যানেলের দিকে। কর্নেল দীনগোপালের বাড়ির কাছে পৌঁছে একটু দাঁড়ালেন। অমরবাবু বললেন—কী ব্যাপার?

বাড়িটা উঁচু জমির ওপর, রাস্তাটা নিচুতে। গরাদ-দেওয়া গেটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, প্রভাতরঞ্জন উত্তেজিতভাবে কিছু বলছেন এবং অরুণ, তার স্ত্রী ঝুমা, দীপ্তেন্দু তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বারান্দার পশ্চিম দিকটায় রোদ পড়েছে। সেখানে বেঞ্চে বসে ঝিমোচ্ছে দুজন বন্দুকধারী সেপাই।

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বললেন - আশ্চর্য তো!

—কী আশ্চর্য? অমরবাবু ব্যস্তভাবে জানতে চাইলেন।

—মিঃ ত্রিবেদী···

কর্নেলকে থামতে দেখে অমরবাবু বললেন—কোথায় ত্রিবেদী সায়েব?

কর্নেল বললেন—আসুন তো! ব্যাপারটা জানা দরকার।

অমরবাবু তাঁকে অনুসরণ করলেন। গেট খুলে তাঁরা লনে ঢুকলে দলটি তাঁদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর প্রায় মারমুখী হয়ে তেড়ে আসতে দেখা গেল প্রভাতরঞ্জনকে। কর্নেলের সামনে এসে তিনি গর্জন করলেন—গেট আউট! আভি গেট আউট! এর পর ত্রিসীমানায় দেখলে তুলে ছুঁড়ে ফেলব।

অমরবাবু ফুঁসে উঠলেন।—কাকে কী বলছেন মশাই? আপনি জানেন ইনি কে?

প্রভাতরঞ্জন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন—খুব জানি। ডি-টে-ক-টি-ভ! টিকটিকি! ঘুঘু! এমন বিস্তর ঘুঘু আমার পলিটিক্যাল লাইনে দেখা আছে। গেট আউট!

বলে কর্নেল কাঁধে ধাক্কা দিতে হাত বাড়ালেন। অমরবাবু সহ্য

করতে পারলেন না। দ্রুত জ্যাকেটের ভেতর থেকে রিভলবার বের করে প্রভাতরঞ্জনের কানের কাছে নল ঠেকিয়ে বললেন—আমি সি আই ডি ইন্সপেক্টর। এখনই এঁর পায়ে ধরে ক্ষমা না চাইলে আপনাকে অ্যারেস্ট করব।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—এ কী করছেন অমরবাবু! আপনিও দেখছি প্রভাতবাবুর মতো নাটুকে মানুষ!

অরুণ, ঝুমা, দীপেন্দু দৌড়ে এল। প্রভাতরঞ্জন হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। ভাঙা গলায় চেঁচালেন—পুলিশ! পুলিশ!

এ এস আই মানিকলাল বাড়ির পেছনদিকে কোথাও ছিলেন। ছুটে এলেন। সেপাই দুজনও উঠে দাঁড়িয়েছিল। এগিয়ে এল।

মানিকলাল অমরবাবুকে স্যালুট ঠুকে বললেন—কী হয়েছে স্যার?

অমরবাবু রিভলবার জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বললেন—এই লোকটাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যান। আপনাকে নিশ্চয় বলে দেওয়া হয়েছে, আজ এই কেসের চার্জে আমি আছি—ইউ আর টু ক্যারি আউট মাই অর্ডার।

মানিকলাল প্রভাতরঞ্জনের দিকে এগিয়ে এলে কর্নেল বললেন—প্লিজ মিঃ লাল! অমরবাবু, আপনাকে অনুরোধ করছি, এখানেই ব্যাপরটা শেষ হোক। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

অমরবাবু রাগে গরগর করছিলেন।—কী সাহস! আপনার গায়ে হাত তুলতে এলেন উনি?

প্রভাতরঞ্জন মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গলার ভেতর বললেন—হাত তুলেছি কি কম দুঃখে? দীনুদাকে উনি বলেছেন আমি শান্তর বডি আমার মাফলারে বেঁধে কড়িকাঠে ঝুলিয়েছি! আমি খুনীকে চিনি! দীনুদা আমাকে সব বলেছে। শুনে আমার মাথার ঠিক ছিল না।

কর্নেল অবাক হয়ে বললেন—দীনগোপালবাবু বলেছেন আপনাকে?

—হ্যাঁ। বলে প্রভাতরঞ্জন ভাঙা গলায় ডাকতে থাকলেন—দীনুদা! দীনুদা!

দীপ্তেন্দু বলল—আমি ডেকে আনি জ্যাঠামশাইকে! ব্যাপারটা খুব গোলমেলে।

সে পা বাড়ালে কর্নেল বললেন—থাক দীপ্তেন্দু! বরং আমরাই ওঁর কাছে যাই।

দীপ্তেন্দু ঝাঁঝাল স্বরে বলল—বড্ড গোলমেলে ঠেকছে ব্যাপারটা। এর মীমাংসা হওয়া দরকার।

—নিশ্চয় দরকার। কারণ আমারও সব গোলমেলে ঠেকছে। কর্নেল দাড়িতে অভ্যাসমতো হাত বুলিয়ে একটু হাসলেন।—দীনগোপালবাবু হঠাৎ মত বদলেছেন, এই একটা পয়েণ্ট। আরেকটা পয়েণ্ট হলো, ও সি মিঃ ত্রিবেদীও মত বদলেছেন। দুটোই পরস্পর সংযুক্ত পয়েণ্ট।

অমরবাবু বললেন—আমার মনে হয় কর্নেল, ব্যাপারটা খুলে বলা উচিত। নৈলে আবার ড্রামাটিক কিছু ঘটে যেতে পারে।

—পারে। আপনি ঠিকই বলেছেন। কর্নেল সায় দিলেন। মিঃ ত্রিবেদীকে বলেছিলাম প্রভাতবাবুকে অ্যারেস্ট করে লক-আপে ঢোকাতে। তা করেননি।

প্রভাতবাবু চমকে উঠে বললেন—শুনুন! শুনুন তাহলে! সাধে কি আমি···

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন—আপনার নিরাপত্তার স্বার্থে তা করতে বলেছিলাম। কারণ খুনী এখন বিপন্ন বোধ করছে। অথচ মিঃ ত্রিবেদী কেন আপনাকে গ্রেফতারে মত বদলালেন? সম্ভবত দীনগোপালবাবু তাঁকে কিছু বলে এসেছেন পরে।

দীপ্তেন্দু বলল—জ্যাঠামশাইকে ডাকলেই জানা যাবে।

অরুণ বলল—তুই যা দীপু! ওঁকে ডেকে আন।

দীপ্তেন্দু হন্তদন্ত পা বাড়াল। কর্নেলের কণ্ঠস্বর হঠাৎ বদলে গেল। গম্ভীর স্বরে ডাকলেন—দীপ্তেন্দু! শোনো, কথা আছে।

দীপ্তেন্দু একবার ঘুরে তাঁর দিকে তাকাল। মুখের রেখায় বিকৃতি ফুটে উঠল। তারপর সে আবার পা বাড়াল। দৌড়ে যাবার ভঙ্গি।

কর্নেল সবাইকে অবাক করে দিয়ে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেললেন। দীপ্তেন্দু নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল। কর্নেল চোখের পলকে তাকে জুডোর এক প্যাঁচেই ধরাশায়ী করে ডাকলেন অমরবাবু! মিঃ লাল! শান্তর খুনীকে গ্রেফতার করুন।

অমরবাবু ফের রিভলবার বের করে ছুটে গেলেন। মানিকলাল গিয়ে দীপ্তেন্দুর জ্যাকেটের কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে সোজা দাঁড় করিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে অমরবাবু তার কানের নিচে রিভলবারের নল ঠেকিয়েছেন। দীপ্তেন্দু মুখ নামিয়ে রইল।

প্রভাতরঞ্জন হাঁ করে তাকিয়ে ছিলেন। এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরল। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন—আমি হতচ্ছাড়াকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম ...আমার ভুল হয়েছিল...আমি ওকে...

—সোনার লোভে, প্রভাতবাবু! কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন। —সোনার ঠাকুরের ভাগ দিতে চেয়েছিল দীপ্তেন্দু!

প্রভাতরঞ্জন দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলেন।— আমি পাপী! মহা-পাপী!

মানিকলাল অমরবাবুকে বললেন—আসামীকে নিয়ে যাই, স্যার!

কর্নেল বললেন—এক মিনিট। আগে আসামীর কাছ থেকে ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ আর 'নিকোটিমরফিডের' তৃতীয় অ্যাম্পুলটা বের করে নিই।

বলে দীপ্তেন্দুর জ্যাকেটের সামনের বাঁ দিকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। বেরিয়ে এল একটা সূচ-বসানো ইঞ্জেকশান সিরিঞ্জ। মানিকলাল বললেন—সর্বনাশ! একেবারে রেডি সিরিঞ্জ!

—হ্যাঁ। হঠাৎ দৌড়ুনোর ঝাঁকুনিতে জ্যাকেট ফুঁড়ে সূচটা বেরিয়ে পড়েছিল। কর্নেল বললেন।—তবে নিকোটিমরফিড ভরা ছিল, জানতাম না। তার মানে এবার দীনগোপালবাবুকেই চুপ করিয়ে দিতে যচ্ছিল দীপ্তেন্দু।

অরুণ ও ঝুমা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এতক্ষণে ঝুমা এগিয়ে এল, তার পেছনে অরুণ। ঝুমার হাতের মুঠোয় একটা খালি অ্যাম্প্যুল। দেখিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল—এটা কিছুক্ষণ আগে আমি ওইখানে ঘাসের ভেতর কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। তাই নিয়েই আমরা আলোচনা করছিলাম। এমন সময় আপনারা এসে পড়লেন। কিন্তু আমরা···আমি কল্পনাও করিনি দীপ্তেন্দু এ কাজ করবে।

কর্নেল বললেন—প্রভাতবাবু! তাহলে আপনি কি দীনগোপাল-বাবুকে খুনীর নাম বলে দিয়েছেন?

প্রভাতরঞ্জন চোখ মুছে শ্বাস ফেলে বললেন—হ্যাঁ। সকালে মর্নিং ওয়াক করে এসে দীনুদা আমাকে আড়ালে ডেকে চার্জ করলেন। আমি···আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। নামটা বলে দিলাম। শুনে দীনুদা কেঁদে ফেললেন। শেষে বললেন, ঠিক আছে। চেপে যাও। আমিও চেপে থাকি। বরং সোনার ঠাকুরটা পুলিশকে জমা দেবার ব্যবস্থা করি। ওটাই সর্বনাশের মূল।

—তারপর উনি কি বেরিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তাহলে মিঃ ত্রিবেদীকে কিছু বলে এসেছেন। কর্নেল বললেন। —মিঃ লাল! আপনি আসামীকে থানায় নিয়ে যান। মিঃ ত্রিবেদীকে শীগগির আসতে বলুন।

দীপ্তেন্দুকে ধরে নিয়ে গেলেন মানিকলাল। সেপাই দুজন সঙ্গে চলল। কর্নেল বললেন—চলুন, দীনগোপালবাবুর সঙ্গে এবার দেখা করা যাক।

যেতে যেতে অমরবাবু বললেন—কর্নেল! খুনী কে, আপনি জানতেন। কিন্তু কী সূত্রে জানলেন, সবটা শুনতে চাই। দীনগোপালবাবুর ঘরে বসে শুনব।

কর্নেল বললেন—সূত্র অতি সামান্যই! মাত্র একটা সূত্রে।

—বলেন কী! একটা মাত্র সূত্র?

—হ্যাঁ, একটা মাত্র সূত্র। কিন্তু মোক্ষম সূত্র।

—কী সেটা?

কর্নেল বারান্দায় উঠে বললেন—শান্তকে মারা হয়েছে বিষাক্ত নিকোটিনের ইঞ্জেকশানে। দীপ্তেন্দু পেশায় মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভ। গতকাল নিজেই অতিবুদ্ধিবশে অর্থাৎ বেগতিক দেখে জানিয়েছিল, তার ব্যাগ থেকে একটা বিষাক্ত ইঞ্জেকশানের অ্যাম্প্যুল চুরি গেছে। দুটো অ্যাম্প্যুল ছিল নাকি। কিন্তু আসলে ছিল তিনটে অ্যাম্প্যুল—সে তো দেখতেই পেলেন। যাই হোক, ওর কথায় সন্দেহ করার উপায় ছিল না। স্টেটমেণ্ট দিয়ে চলে যাচ্ছে, হঠাৎ আমি পিছু ডেকে জিজ্ঞেস করলুম, ওষুধটা কি ওর কোম্পানি নতুন ছেড়েছে বাজারে? ও বলল, হ্যাঁ, নতুন। এটাই আমার সূত্র। নতুন' শব্দটা!

অরুণ বলল—বুঝলাম না।

কর্নেল একটু দাঁড়িয়ে বললেন - না বোঝবার কী আছে? বাজারে নতুন ছাড়া বিষাক্ত ওষুধ। সে-ওষুধটা কী, এ বাড়িতে একমাত্র দীপ্তেন্দুর নিজেরই জানার কথা। আর কে জানবে? এ-বাড়িতে তো সে ওষুধ বেচতে আসেনি এবং কেউ এ বাড়িতে ডাক্তারও নন যে, তাঁকে নতুন ওষুধটার গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে বোঝাবে। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাঃ তার কাছে ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ থাকার কথা কে জানবে, সে নিজে ছাড়া? সে তো ডাক্তার নয়।

বসার ঘরে ঢুকে প্রভাতরঞ্জন বললেন—রাত চারটেয় ওই সোফায় সবে শুয়েছি, কিন্তু জেগেই আছি, আলো নিভিয়ে দিয়েছি—হঠাৎ পায়ের শব্দ। দেখি, কেউ উঠে যাচ্ছে সিঁড়িতে। আমার একটু গোয়েন্দাগিরির স্বভাব। একটু পরে চুপিচুপি উঠে গেলাম। গিয়ে শুনি শান্তর ঘরে ধস্তাধস্তির শব্দ। তারপর আমার বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে গেল। ভাইয়ে-ভাইয়ে খুনোখুনি! কী করব, বলুন?...

দীনগোপাল বিছানায় বসেছিলেন তাকিয়ায় হেলান দিয়ে। হাতে

একটা ময়লা হয়ে-যাওয়া সোনার নৃসিংহমূর্তি। মুখ তুললেন। বিভ্রান্ত দৃষ্টি।

অরুণ বলে উঠল—ওঃ! কী যে হতো আর একটু হলেই! দীপু সোনার ঠাকুর পেয়ে যেত। জ্যাঠামশাইকে · ও গড!

ঝুমা কপালে বুকে হাত ঠেকিয়ে বলল—ঠাকুর বাঁচিয়ে দিয়েছেন!

দীনগোপাল আস্তে বললেন—ত্রিবেদী সায়েব আসেননি?

—এখনই এসে যাবেন। বলে কর্নেল ঘরে ঢুকলেন।

দীনগোপাল একটু কেশে ক্লান্তভাবে বললেন—আপনারা বসুন। বউমা, এঁদের জন্য চা বা কফির ব্যবস্থা করো।

ঝুমা ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেল। কর্নেল একটু হেসে বললেন—আমি একটা ফাঁদ পাততে চেয়েছিলাম। কেন আপনি হঠাৎ মত বদলালেন দীনগোপালবাবু?

—আমার আর ধৈর্য রইল না। অসহ্য লাগছিল। দীনগোপাল কাতরস্বরে বললেন।—ভোরবেলা আপনার সঙ্গে কথা বলার পর পথে যেতে যেতে আমার মনে হলো, বড্ড ভুল করে আসছি এতদিন। সোনার ঠাকুর নয়, সোনা—নিছক সোনার লোভ বড় সর্বনেশে। আমার বিবেক কর্নেল, বিবেক আমাকে যা বলল, তাই করলাম। এই সোনার পিণ্ডটা তুলে নিয়ে এলাম পিপুলতার বেদী থেকে। বেদীর এক কোণার নিচে পোঁতা ছিল। ওটা একটা দেবতার থান। নিরাপদ জায়গা। এলাকার কোনও মানুষ ওখানে মাটি খুঁড়ে অপবিত্র করবে না জানতাম।

প্রভাতরঞ্জন ফুঁপিয়ে উঠলেন।—কিন্তু দীপু এবার তোমাকেই খুন করতে আসছিল জানো?

—তুমি থামো! দীনগোপাল ধমক দিলেন।—ন্যাকামি করে বুড়ো বয়সে কাঁদতে লজ্জা হয় না? বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসি তুমি! আমাকে খুন করত দীপু? আমি রেডি ছিলাম। দেখছ? খুনী ভাইপোর হার্ট ছেঁদা করে দিতাম। দরজায় দেখলেই এইটে বিঁধিয়ে দিতাম।

বলে খাটের পেছন থেকে নবর সেই বল্লমটা তুলে দেখালেন। ফের বললেন—কিন্তু তুমি বাঁচবে কী করে, সে কথা এবার চিন্তা করো। তুমি খুনের প্রমাণ চাপা দিতে চেয়েছিলে! তুমি হারামজাদা দীপেটাকে বাঁচতে সাহায্য করেছিলে। তুমি খুনীর অ্যাসিস্ট্যান্ট! হাঁদা মাথামোটা, শিবের ষাঁড়!

প্রভাতরঞ্জন কাঁচুমাচুভাবে বললেন—সব খুলে বলব আদালতে। তাতে জেল হবে, হোক! জেলে জেলে জীবন কেটেছে। আমি জেলের ভয় করি না।

দীনগোপাল বাঁকা মুখে বললেন—হুঁ, তুমি তো জেলের পাঁচিল টপকাতে ওস্তাদ! আর আজকাল যা জেলের অবস্থা হয়েছে! রোজই তো কাগজে পড়ি কয়েদি পালাচ্ছে—বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো।

অমরবাবু হাসলেন।—উনি রাজসাক্ষী হবেন। ওঁকে বাঁচিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা যাবে।

—আপনি কে?

কর্নেল বললেন—প্রসূনের জামাইবাবু। কলকাতার সি আই ডি ইন্সপেক্টর অমর চৌধুরী।

দীনগোপাল ভুরু কুঁচকে কিছু স্মরণ করার চেষ্টা করে বললেন—নামটা চেনা লাগছে।...ও! তুমি প্রমোদের ছেলে না? প্রসূন বলত বটে তোমার কথা। দীনগোপাল সোজা হয়ে বসলেন।—তোমার বাবা ছিলেন আমার স্নেহভাজন। বন্ধুও বলতে পারো। নামকরা শিকারী ছিলেন। সরডিহি আসতেন মাঝে মাঝে শিকার করতে। তোমার বাবা কেমন আছেন?

অমরবাবু বললেন—বাবা গত বছর মারা গেছেন জ্যাঠামশাই!

—আহা রে! বলে বিষণ্ণ দীনগোপাল একটু চুপ করে থাকলেন।—তুমি আমাকে জ্যাঠামশাই বললে। খুব ভাল লাগল। বলে কর্নেলের দিকে তাকালেন দীনগোপাল।—খুনেটাকে ধরতে পেরেছেন, না পালিয়ে গেছে?

প্রভাতরঞ্জন বললেন—তোমাকে খুন করতে আসছিল। কর্নেল—সায়েব পেছন থেকে আমার মতোই জুডোর প্যাঁচে ওকে মাটিতে ফেলে কুপোকাত করেছেন।

—শাট আপ! তোমার সঙ্গে কথা বলব না। কর্নেল, বলুন!

কর্নেল বললেন—তাকে গ্রেফতার করে থানায় পাঠানো হয়েছে, দীনগোপালবাবু!

-নবর কী হবে? নব ছাড়া আমি যে অচল!

—আশা করি, ত্রিবেদী সায়েব তাকে আর আটকে রাখবেন না। সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

দীনগোপাল বিকৃত মুখে বললেন— ও সি ভদ্রলোক আপনার চেয়ে এককাঠি সরেস। তাঁকে বললাম, নবকে ছেড়ে দিয়ে প্রভাতকে ধরে নিয়ে আসুন। ওর পেটে গুঁতো মারলে সব বেরুবে। তো বলেন কী, কর্নেলসায়েবের ফাঁদ আমিই পাতব। কর্নেলসায়েব টিলাপাহাড়ে ফাঁদ পাততে চান, আমি পাতব আপনার ঘরে। আপনি সোনার ঠাকুর হাতে নিয়ে বসে থাকবেন!....তা এই তো বসে আছি। তার আগেই খুনে বদমাশকে পাকড়াও করে কর্নেলসায়েবই টেক্কা দিলেন।

বলে ঘুরলেন কর্নেলের দিকে।—আপনি আগেই জানতে পেরেছিলেন কে শান্তর আসল খুনী? আপনার মন্তরটা কী?

কর্নেল একটু হেসে বললেন—মন্তরটা হল: 'নতুন ওষুধ'।

—হেঁয়ালিটা এবার ছাড়ুন তো মশাই!

কর্নেল তাঁর ছোট্ট সূত্রটির লম্বা চওড়া ব্যাখ্যা দিতে থাকলেন। ব্যাখ্যা শেষ হতে হতে ঝুমা ট্রে সাজিয়ে কফি আর স্ন্যাক্স্ নিয়ে এল। সেই সময় সদলবলে হাজির হলেন গণেশ ত্রিবেদী। তাঁর সঙ্গে ভগবানদাস পাণ্ডেও।

ত্রিবেদীর প্রথমেই চোখ গেল সোনার ঠাকুরের দিকে। বললেন—বাঃ! কথা রেখেছেন দীনগোপালবাবু! কিন্তু আমি দুঃখিত, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার খুনীকে আমার ফাঁদে পড়ার সুযোগই দিলেন না!

হারিয়ে দিলেন বুদ্ধির খেলায়। ওকে! হার মানছি। অ্যাণ্ড কনগ্রাচুলেশন!

তিনি কর্নেলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, মুখে অট্টহাসি। কর্নেল হ্যাণ্ডশেক করে বললেন তবে আপনিও পরোক্ষে আমাকে বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে দিয়েছেন মিঃ ত্রিবেদী!

—সে কী! কীভাবে বলুন তো?

—প্রভাতবাবুকে আমার কথামতো গ্রেফতার না করে।

ত্রিবেদী চেয়ার টেনে বসে বললেন—আমি ভাবলাম, তাহলে খুনী সতর্ক হয়ে যাবে। কারণ প্রভাতবাবু তাকে সাহায্য করেছেন এবং তার চেয়ে বড় কথা, প্রভাতবাবু প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। প্রভাতবাবুকে গ্রেফতার করলেই সে পালাবে।

—ঠিক তাই।....কর্নেল পাণ্ডের দিকে ঘুরে বললেন—আপনাকে খুব দুঃখিত দেখাচ্ছে মিঃ পাণ্ডে!

ত্রিবেদী ফের জোরে হেসে উঠলেন।—কালা কুত্তা! দা ব্ল্যাক ডগ এপিসোড! আমি ওঁকে বোঝাতে পারছি না। কী দেখতে কী দেখেছেন। মঙ্গল সিং মরা মানুষ। আপনি তার ভূত দেখেছেন। তবে কুকুরের ব্যাপারটা আলাদা। কোনও কোনও কুকুরের অদ্ভুত স্বভাব থাকে। জিনিসপত্র কামড়ে নিয়ে পালায়। একবার আমার একপাটি জুতো নিয়ে পালিয়েছিল। স্যুটকেসটা নিশ্চয় চামড়ার ছিল, পাণ্ডেজি!

পাণ্ডে মাথা নেড়ে বললেন—নাঃ! ডাকু মঙ্গল সিং বেঁচে আছে। আমি তাকে খুঁজে বের করবই। আর ওর কালো কুকুরটাকে গুলি করে মারব।....

দীনগোপাল ঝুমার উদ্দেশ্যে বললেন—নীতু কোথায়? তাকে দেখছিনা কেন?

ঝুমা বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেল—বেড়াতে বেরিয়েছে। আমি ওকে খুঁজে আনছি।

একটু চুপ করে থাকার পর দীনগোপাল বললেন—নব? ও সি

সায়েব! নবকে ছাড়ছেন না কেন? আমার ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে।

ত্রিবেদী বললেন—নব আমাদের সঙ্গেই এসেছে। কিচেনে ঢুকেছে। আপনার বউমার কাছে এখন সম্ভবত সে চার্জ বুঝে নিচ্ছে। আমাদের জন্য কফি আনতে বলছি তাকে।

কর্নেল হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—লাল ঘুঘুর ঝাঁকটি এতক্ষণ এসে গেছে। এই চান্সটা মিস করতে চাই নে। অমরবাবু, আপনি এখানেই আড্ডা দিন ততক্ষণ। আমিএকা যেতেচাই। লাল ঘুঘুর ছবি তুলতে খুব সতর্কতা দরকার।

দ্রুত বেরিয়ে এলেন কর্নেল। বারান্দায় একটু থেমে বাইনোকুলার রাখলেন চোখে। তারপর পা বাড়ালেন।…

গেটের কাছে ঝুমা দাঁড়িয়ে খুঁজছিল নীতাকে। ক্যানেলের দিকে দৃষ্টি। কর্নেলকে দেখে সে বলল—কর্নেল! আপনার বাইনোকুলার দিয়ে নীতাকে খুঁজে বের করুন তো! আমার বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে।

কর্নেল তার হাতে বাইনোকুলার দিয়ে বললেন—উত্তর-পূর্বে ইরিগেশান বাংলোর ওখানটা লক্ষ্য করো।

ঝুমা দেখতে দেখতে বলল—সর্বনাশ!

কর্নেল হাত বাড়িয়ে বললেন—সর্বনাশ কিসের ঝুমা? কৈ, আমার যন্তর দাও। বেশিক্ষণ দেখতে নেই ওসব দৃশ্য। অবশ্য এও একধরনের খুনোখুনি বলা চলে। পরস্পর পরস্পরের হার্টে ছুরি মারছে।

ঝুমা দূরবীন যন্ত্রটি ফেরত দিয়ে বলল—প্রসূন দীপ্তেন্দুর চেয়ে সাংঘাতিক ছেলে!

—ঝুমা, প্রেম তার চেয়েও সাংঘাতিক। বলে কর্নেল নিচের রাস্তায় নেমে গেলেন।

ঝুমা বলল—একটা কথা, কর্নেল!

—বলো।

—বাসস্টপের লোকটা কে, জানেন? জানতে পেরেছেন?

—তুমি জানো মনে হচ্ছে!

ঝুমা মাথা নাড়ল।—জানি না। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে প্রসূন এবং নীতার দুজনেই চক্রান্ত করে···

কর্নেল হাত নেড়ে বললেন না।

—তবে কে সে?

—দীপ্তেন্দু। দেখো ঝুমা, অপরাধীদের এই একটা চিরাচরিত স্বভাব অতিরিক্ত চালাকি বলো, কিংবা উল্টোটাও বলো, নিজের অলক্ষ্যে নিজেই একটা-দুটো সূত্র রেখে দেয়। এক্ষেত্রে দেখো! শান্ত, নীতা, তোমার স্বামী অরুণ, প্রভাতবাবু প্রত্যেকে বলেছেন, বাসস্টপে একই চেহারার একটা লোক তাঁদের একটা কথা বলে নিপাত্ত হয়ে গেছে। কিন্তু দীপ্তেন্দু কী বলেছে?—না, তার স্ত্রীকে ওই রকম চেহারার একটা লোক বাসস্টপে একই কথা বলেছে। কেন দীপ্তেন্দু এমন বলল? তার মনে অপরাধবোধজনিত দুর্বলতা একটা সংশয় সৃষ্টি করেছিল। কী সংশয়?—না দৈবাৎ যদি কেউ তাকে চিনে ফেলে থাকে! নিজের স্ত্রীর নামে ব্যাপারটা সে চাপাতে চেয়েছিল। এতে দৈবাৎ কারুর মনে সন্দেহ দেখা দিলেও সেটুকু ঘুচে যাওয়ার চান্স আছে। দীপ্তেন্দুর স্ত্রী স্কুল-টিচার। রেসপন্সিব্‌ল্ পার্সন। কাজেই ব্যাপারটা গুরুত্ব পাবে।

কর্নেল পা বাড়িয়ে ফের বললেন—যাই হোক। তার মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের কার্ড সে দিয়েছিল মিঃ ত্রিবেদীকে। ওতে তার বাড়ির ফোন নম্বর ছিল। সকালে আমি কলকাতায় ট্রাংককল করি ওর স্ত্রীকে।

ঝুমা সাগ্রহে বলল—কী বললেন রমাকে?

কর্নেল হাসলেন।—বললাম, 'আপনি বাসস্টপে সেদিন সন্ধ্যায় যে সানগ্লাস পরা দাড়িওলা লোকটাকে দেখেছিলেন, যে আপনার স্বামীকে বলতে বলেছিল সরডিহির জ্যাঠামশাইয়ের বিপদ, সে ধরা পড়েছে।'

—রমা কী বলল শুনে?

—ভদ্রমহিলা বললেন, 'কী আজগুবি কথাবার্তা বলছেন? কে

আপনি?' আমি বললাম, 'সরডিহি থেকে পুলিশ অফিসার বলছি। আপনার দেখা বাসস্টপের লোকটাকে পাকড়াও করেছি।' রমা দেবী বললেন, 'টকিং ননসেন্স। এমন কোনও ব্যাপার ঘটেনি। আমার স্বামী এক সপ্তাহ আগে শিলং গেছেন। ওঁর অফিসে রিং করে জেনে নিন। এই নিন ওঁর অফিসের নাম্বার।' সে-নাম্বার অবশ্য তখন আমার হাতেই।

—তারপর দীপুর অফিসে ফোন করলেন?

—করলাম। ঘণ্টা দুই পরে অফিস আওয়ার্সে। থানা থেকে ট্রাংককল। লাইন পেতে দেরি হয় না। ওর অফিস রমা দেবীর কথা কনফার্ম করল। দীপ্তেন্দু এক সপ্তাহ আগে নর্থ-ইস্টার্ন জোনে ট্যুরে গেছে।

বলে কর্নেল হনহন করে হেঁটে চললেন। দিনের আলো গোলাপী হয়ে এসেছে। কুয়াশার ধূসরতা ঘনিয়েছে পশ্চিমের টিলার গায়ে। ঝুমা গেটে দাঁড়িয়ে রইল। দৃষ্টি সেচবাংলোর দিকে।···

উঁচু জমিটার ঝোপে লাল ঘুঘুর ঝাঁক বসে আছে। টেলিলেন্স ক্যামেরায় জুড়ে পরপর কয়েকটা ছবি তুললেন কর্নেল। তারপর সেই নিচু জমিতে নামলেন এবং ইচ্ছে করেই জুতোর শব্দ করলেন। ঝাঁকটা উড়ল।

অমনি উড়ন্ত অবস্থায় ফের ঘুঘুর ঝাঁকটির ছবি তুললেন। ক্যামেরা নামিয়ে ওদের গতিপথ লক্ষ্য করেছেন, সেই সময় চোখের কোণা দিয়ে দেখতে পেলেন, কী একটা চকচকে জিনিস ঝিলমিল করছে।

কর্নেল এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, ইঞ্জেকশানের একটা অ্যাম্পুল। শান্তর মাফলারের সঙ্গে এখানে ফেলে গিয়েছিল দীপ্তেন্দু। রুমালে জড়িয়ে কুড়িয়ে নিলেন অ্যাম্প্যুলটা। এটা একটা প্রমাণ। কোর্ট একজিবিট।

একটু পরে বাইনোকুলারে চারদিক দেখে নিয়ে ছোট টিলাটার দিকে হেঁটে চললেন কর্নেল।

শীর্ষে পিপুলতলায় উঠে বেদীর নিচে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটা টাটকা খোঁড়া গর্ত দেখতে পেলেন। এখানেই দীনগোপাল মূর্তিটা পুঁতে রেখেছিলেন। এতক্ষণে আবিষ্কার করলেন, এখানে বেদীর গায়ে স্বস্তিকা চিহ্নের একটা খোদাই করা রেখার নিচে একটা ছোট্ট গোল লালচে ছোপ। সিঁদুরেরই ছোপ। বেরঙা হয়ে গেছে এবং ঘাসের ভিতর চাপা পড়েছে। সংকেতচিহ্ন দিয়ে রেখেছিলেন দীনগোপাল।

হঠাৎ কুকুরের গরগর চাপা গর্জন শুনে উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল। দ্রুত রিভলবার এবং ফর্মুলা-টোয়েন্টির কৌটো বের করলেন জ্যাকেট থেকে।

কুকুরটা নিচের দিকে পাথরের আড়ালে গর্জন করছে। কিন্তু আসছে না। কর্নেল ডাকলেন—মঙ্গল সিং! আ যাও। ডরো মাত! চলা আও মঙ্গল সিং! হাম তুমহারা দোস্ত্ হ্যায়!

পশ্চিমের ঢালে নিচের দিকে বড় পাথরের আড়াল থেকে একটা প্রৌঢ় শীর্ণ চেহারার লোক বেরুল। কালো অ্যালসেশিয়ানটা তার পায়ের কাছে। সে জিভ বের করে জুলজুলে চোখে কর্নেলকে দেখছে আর সমানে গরগর করছে।

কর্নেল হাসলেন।—কুত্তা বহৎ ট্রেইণ্ড মালুম হোতা। ঠিক হ্যায়। উসকো হুঁয়া বইঠ্‌কে রহনে হুকুম দো। তুম একেলা আও, মঙ্গল সিং! ঘাবড়াও মাত্। হাম দোস্ত্ হ্যায়।

মঙ্গল সিং ডুকরে কেঁদে উঠল হঠাৎ।—হাম জিন্দা আদমি নেহি, সাব! হামকো মার ডালা—পানিমে ফেক দিয়া। বাবুলোগোঁনে চোরি কিয়া, তো হাম্‌কা পর যেত্তা জুলুম!

—জানি। হামকো সবহি মালুম হ্যায় মঙ্গল সিং! বলে কর্নেল বেদীর কাছে গর্তটা দেখালেন।—ইয়ে দেখো। বুঢ়াবাবু সোনেকা ঠাকুর উঠাকে লে গেয়া। দে দিয়া পুলিশ কি হেফাজতমে। অব কিস্ লিয়ে তুম হিঁয়া ঘুমতে হো? কৈ ফয়দা নেহি জি!

কর্নেল পকেট থেকে একট একশো টাকার নোট বের করে ফের

বললেন—আভি তুরন্ত্ ফিরোজাবাদ হোকে কলকাত্তা চলা যাও। বড়া শহর, মঙ্গল সিং! তুস্রি জিন্দেগি মিলা তুমকো। ইয়ে নয়া জিন্দেগিকি নয়া লড়াই শুরু করো। লে লো ইয়ে রূপেয়া!

মঙ্গল সিং চোখ মুছে বলল—হাম্ ভিখ্ নেহি লেতা সাব!

—বখশিস মঙ্গল সিং!

—কাহে সাব?

কর্নেল হেসে উঠলেন!—তুমহারা কুত্তাকা খেল দেখা। বঢ়েয়া সার্কাস দেখায়া তুম্! এইসা ডগ-ট্রেইনার হাম কভি নেই দেখা।

নোটটা বেদীতে রেখে কর্নেল একটুকরো পাথর চাপা দিলেন। তারপর চাপাস্বরে ফের বললেন—পাণ্ডেজি পুলিশ ফোর্স লেকে আতা তুরন্ত্ ভাগ যাও।

বলে হনহন করে নেমে এলেন পূবের ঢাল দিয়ে। ঝোপজঙ্গলের ভেতর ঢুকে সোঁতায় নামলেন। শীর্ণ সোঁতায় পাথরের ফাঁক দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। পাথরে পা রেখে ওপারে গেলেন কর্নেল। তারপর রাস্তায় উঠলেন। সাঁকোয় দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে দেখলেন, কালো কুকুরটি একশো টাকার নোটটা মুখে করে নিয়ে নেমে যাচ্ছে। টিলার ওধারে অদৃশ্য হয়ে গেল দুটি প্রাণী।

একটা আশ্চর্য তৃপ্তির স্বাদে আপ্লুত হলেন কর্নেল। কালো কুকুরের সার্কাস দেখার জন্য নাকি সরডিহি এলাকার প্রাক্তন ডাকু মঙ্গল সিংয়ের ভয়ঙ্কর-নিষ্ঠুর ছুরিটার স্যুভেনির মূল্য ওই একশোটা টাকা?

অথবা নিজের জীবনের প্রতীক-মূল্য মিটিয়ে দিয়েছেন তাঁর আততায়ীকে? সেকেণ্ডের জন্য লাফ দিয়ে সরে না গেলে তাঁর মৃত্যু হতো সেদিন বিকেলে। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদটিকে ব্যর্থ করে দিতে পেরেছিলেন—হয়তো দৈবাৎ, একান্তই দৈবাৎ। তাই নিজের জীবন ফিরে পাওয়ার মূল্য এভাবে শোধ করলেন। পৃথিবী নামক একটি প্রাণময় গ্রহে বেঁচে থাকার কত রকম স্বাদ, কত বিচিত্র অনুভূতি, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ, প্রকৃতি ও প্রাণীর কত রহস্যজালে পরিকীর্ণ এই

পৃথিবীকে একটু একটু করে বোঝবার চেষ্টা এই জীবন। সেই জীবনের মূল্য ওই সামান্য টাকায় শোধ হবার নয়। ওই কাগজে মুদ্রাটি নিতান্তই তাঁর কৃতজ্ঞতার প্রতীক মাত্র। মঙ্গল সিং তাঁকে জীবনের মূল্য উপলব্ধির সুযোগ দিয়েছে।

জীবনে কতবার এভাবে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিটকে সরে গেছেন কর্নেল। আর প্রতিবার যেন একটি করে পর্দা উন্মোচিত হয়েছে জীবনের। এভাবে খোলস ছাড়তে ছাড়তে বারবার নতুনতর জীবনের মধ্যে বেঁচে থাকতে থাকতে নির্বাণের পরম স্তরে পৌঁছুতে চান কর্নেল নীলাদ্রি সরকার—স্বাভাবিক মৃত্যুই তাঁর বাঞ্ছিত। অস্বাস্থ্যে নয়, আততায়ীর আঘাতে নয়, দুর্ঘটনায় নয়—তিনি চান সেই মৃত্যু, যা প্রকৃতি তাঁকে আদরে উপহার দেবে। প্রকারান্তরে যা প্রকৃতির নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া। প্রকৃতি থেকে এসে প্রকৃতিতে ফিরে যাওয়া। খেলাশেষে ক্লান্ত শিশু যেভাবে ঘরে ফেরে, মা তাকে ধুলো মুছিয়ে কাছে টেনে নেন।

—কর্নেল।

চমকে উঠলেন কর্নেল। ঘুরে দেখলেন, নীতা ও প্রসুন। প্রসুনই তাঁকে ডেকেছে। তার মুখে বিষাদ-মেশানো ক্ষীণ হাসির রেখা। নীতার মুখে ঈষৎ গাম্ভীর্য। টিলাপাহাড়ের ফাঁক দিয়ে আসা শেষ লালচে রোদের ছটায় সেই গাম্ভীর্য ঈষৎ উজ্জ্বলও।

কর্নেল একটু হাসলেন। কনগ্রাচুলেশন!

নীতা বলল আমি আপনাকে এখানে দেখতে পেয়ে চলে এলাম।

—আর পুঁটু সরি!

প্রসুন বলল—নেভার মাইণ্ড! আমি পুঁটু! পুঁটু বলেই তো আমার বউ পালায়।

তাহলে প্রসুন বলাই নিরাপদ। কর্নেল চুরুট বের করে বললেন—তো আমাকে দেখে নীতা চলে এসেছে। আশা করি, প্রসুনও তাই? অর্থাৎ দুজনে একত্র বেড়াতে বেরোওনি? আমি—এই বৃদ্ধ ঘুঘু তোমাদের দুজনেরই লক্ষ্য ছিল? ভাল। তো দেখ, এই সময়টাকেই ভারতীয় শাস্ত্রে গোধূলি লগ্ন বলা হয়। এই সময়টা বিপজ্জনক সুন্দর—কারণ এই লগ্নে ভারতীয় নর-নারী বিয়ে নামক ফাঁদে পড়ে। এগেন সরি ডার্লিংস! তোমাদের ক্ষেত্রে পুনর্মিলন বলাই উচিত। সুখী হও।

ঋষির ভঙ্গিতে কর্নেল ডান হাত প্রসারিত করলেন। এবার নীতার ঠোঁটের কোণায় ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল এবং মুহূর্তের জন্য তার মুখে ভারতীয় নারীর লজ্জার রঙ ঝলমল করল। আস্তে বলল সে—চলুন। গল্প করতে করতে ফেরা যাক।......

—:০:—